মাধ্যমিক অর্থনীতি

নবম-দশম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক অর্থনীতি

নবম-দশম শ্রেণী

রচনা
মোঃ মাসুম আলী
মোঃ নূরল আলম

সম্পাদনা
মনতোষ রঞ্জন চক্রবর্তী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক–শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়–শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থনীতি শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি বিষয়কে যুগোপযোগী, জীবনঘনিষ্ঠ ও কর্মমুখী করে তোলার জন্য মাধ্যমিক স্তরের অর্থনীতি পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষাক্রমের সাধারণ উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করা, এর সমস্যাবলি উপলব্ধি করতে শেখানো এবং ব্যবহারিক জীবনে অর্থনীতির জ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দানের দিকে লক্ষ রেখে বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

DEFINITION AND SUBJECT MATTER OF ECONOMICS

১.১.১ ভূমিকা

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ প্রতিনিয়ত অসংখ্য অভাবের সম্মুখীন হয়। একটি অভাব পূরণ হলে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক অভাব দেখা দেয়। এ অভাব পূরণের জন্য সমাজে মানুষ নানা রকম কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত বা অপ্রচুর। তাই মানুষ তার সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। মানব জীবনের অভাবের এ প্রকৃতি এবং তা পূরণের কর্মপ্রচেষ্টা, সৃষ্টির আদি কালেও যেমন ছিল আজো তেমনি আছে। তবে আধুনিককালে মানুষের অভাব বহুগুণ বেড়েছে, অভাব পূরণের কর্মপন্থা আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক হয়েছে। অভাবের তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল হওয়ায় সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যাও পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ কীভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে অর্থ আয় করে, কীভাবে সে তার সীমিত আয় দ্বারা অসংখ্য অভাব পূরণের চেষ্টা করে, তা আলোচনার জন্যই অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে সমাজের বহুমুখী অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায় তা ভালোভাবে অবহিত হওয়ার জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।

১.১.২ অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষের অভাব অসীম। একটি অভাব পূরণ হলে আরো অনেক অভাব একের পর এক দেখা দেয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ প্রভৃতি অসংখ্য জিনিসের অভাব বোধ করে। এসব জিনিস কেনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন কাজকর্মে লিপ্ত হয়। আবার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে মানুষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে এবং তা ভোগের মাধ্যমে অভাব পূরণ করে। এভাবে মানুষ তার অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জন এবং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত যেসব কাজকর্ম করে সেগুলোকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। সুতরাং মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রধানত দুপ্রকার। (ক) অর্থ আয় সংক্রান্ত কার্যাবলি ও (খ) অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলি। অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল লক্ষ্য হল দ্রব্যসামগ্রী ভোগের মাধ্যমে অভাব পূরণ। অর্থ আয় ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্ম ছাড়া অন্যান্য কাজ যেমন, শখ করে গান করা, মায়ের সন্তান লালন পালন করা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ নয়। কারণ এ ধরনের কাজের জন্য কোনো অর্থ উপার্জন বা অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। আবার চুরি বা ভিক্ষার মাধ্যমে অর্থ আয় করা গেলেও তা অর্থনৈতিক কাজ বলে গণ্য হয় না। কেননা এসব কাজ নীতি বিরুদ্ধ ও সামাজিকভাবে গর্হিত। সুতরাং মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত যেসব কাজকর্ম করে সেগুলোকে অর্থশাস্ত্রে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। যেমন, কৃষিকাজ, কলকারখানা ও অফিস আদালতে চাকরি, ব্যবসায় বাণিজ্য, মাছ ধরা, পশু পালন, কামার, কুমার ও অন্যান্য পেশার কাজকর্ম, দ্রব্যসামগ্রী কেনাবেচা প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর অর্থনৈতিক কার্যাবলি নির্ভর করে। অতীতকালের তুলনায় বর্তমান সমাজে মানুষের জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় আমাদের অভাব ও প্রয়োজন ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু সে তুলনায় সম্পদের যোগান অপ্রচুরই থেকে যাচ্ছে। ফলে আধুনিক সমাজে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিধি প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে এক জন মানুষ তার ক্রমবর্ধমান অভাব পূরণের জন্য কখনো কখনো একাধিক অর্থনৈতিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক জন মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে অফিস আদালত বা কারখানায় চাকরি করার পরও প্রয়োজনের তাগিদে কোনো ব্যবসায় বা অন্য কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জনেব চেষ্টা করেন। আবার এক জন কৃষক কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ ধরা বা অন্য কোনো ব্যবসা করে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সামাজিক মানুষ তাদের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করেন। এভাবে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজই এক জন মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজ। মানুষ তার বহুমুখী অভাব পূরণের জন্যই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে।

১.১.৩ বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি কি ধরনের হবে তা নির্ভর করে সে দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, উন্নয়নের মাত্রা এবং সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রাথমিক পেশায় নিয়োজিত থাকে। পক্ষান্তরে উন্নত ও শিল্প সমৃদ্ধ দেশে শিল্প কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি, ব্যবসায় বাণিজ্য, বিভিন্ন প্রকার কারিগরি কাজ প্রভৃতি পেশায় বেশিরভাগ লোক নিযুক্ত থাকে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের শিল্প অনুন্নত এবং শিক্ষার হার কম। এ কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ, পশু-পাখি পালন,মাছ চাষ, ছোট ছোট কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি ইত্যাদি প্রাথমিক পেশার কাজে নিয়োজিত। এ ছাড়া অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্ম করেও অনেক লোক জীবিকা অর্জন করে। বাংলাদেশের জনগণের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

১. কৃষিকাজ : বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের প্রায় ৭০ ভাগ লোকের প্রধান পেশা হল কৃষিকাজ। কৃষকগণ জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করে তার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং কৃষিকাজ এ দেশের প্রধান অর্থনৈতিক কাজ।

২. ব্যবসায় বাণিজ্য : বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শহুরে এবং গ্রামীণ জনগণ নানা রকম ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ ছাড়া শহরাঞ্চলে বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্যেও অনেক লোক নিয়োজিত রয়েছে।

৩. চাকরি : শিল্প কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরি একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কাজ। বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কর্মচারি ও কর্মকর্তা এসব স্থানে চাকরি করে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

৪. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ : বাংলাদেশে শহর ও গ্রামাঞ্চলে নানা রকম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কারখানা রয়েছে। দেশের অনেক লোক এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকম দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে জীবিকা অর্জন করে। সুতরাং এ জাতীয় কাজও এ দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক কাজ।

৫. মাছ চাষ ও মাছ ধরা : বাংলাদেশে পুকুর, দীঘি প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের চাষ করা হয়। উপরন্তু আমাদের জেলে সম্প্রদায় খাল, বিল, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে মাছ ধরে এবং তা বিক্রি করে অর্থ আয় করে। সুতরাং মাছ চাষ ও মাছ ধরা এ দেশের একটি প্রধান অর্থনৈতিক কাজ।

৬. যানবাহন চালনা : বাংলাদেশে সড়ক ও জলপথে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন চালনার মাধ্যমে বহুসংখ্যক লোক জীবিকা অর্জন করে। বাস, ট্রাক, স্কুটার, রিকশা, ঠেলাগাড়ি, গরুরগাড়ি, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতি যানবাহন চালনা করে অর্থ আয় করা এ দেশের একটি অন্যতম অর্থনৈতিক কাজ।

৭. পশু-পাখি পালন : আমাদের দেশে খুব ব্যাপকভাবে না হলেও পশুপাখি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া পালন এবং হাঁস-মুরগির খামার করে অর্থ আয় করা যায়। ইদানিং আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে অনেক লোক পশুপাখির খামার স্থাপনে এগিয়ে আসছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশে আরো অনেকরকম ছোটখাটো পেশা আমাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ধোপা, নাপিত, দর্জি, কামার, কুমার, মুচি প্রভৃতি শ্রেণীর লোক শহর, গ্রাম সর্বত্র তাদের পেশার মাধ্যমে অর্থ আয় করে। আরো রয়েছে ফল, ফুল ও তরিতরকারির চাষ, ঠিকাদারির কাজ ও রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি। বস্তুত, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

১.১.৪ অর্থনীতির সংজ্ঞা

অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ "Economics" এসেছে গ্রীক শব্দ "Oikonomia" (ঐকোনোমিয়া) থেকে। এর অর্থ হল 'গৃহ ব্যবস্থাপনা'। অর্থনীতির চর্চা প্রথম শুরু হয় প্রাচীন গ্রীস দেশে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল অর্থনীতিকে 'গৃহ পরিচালনার বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তন ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানব জীবনের

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ফলে অর্থনীতির সংজ্ঞারও ক্রম পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতির জনক এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' নামে আখ্যায়িত করেন।

তাঁর মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"[১] অর্থাৎ সমাজে কীভাবে সম্পদ উৎপাদন হয় এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হয় তাই অর্থনীতির প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। এ্যাডাম স্মিথই সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শাস্ত্রের রূপ দান করেন।

পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) বলেন, "অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।"[২] সাধারণ কার্যাবলি বলতে মার্শাল মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ মার্শালের মতে, কেবল সম্পদ নয়, বরং সম্পদকে কেন্দ্র করে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়েই অর্থনীতি আলোচনা করে।

আধুনিককালে অর্থনীতির আরো বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সমাজ জীবনে মানুষের অভাব সীমাহীন। কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ সে তুলনায় অপ্রচুর। অর্থনীতি মানুষের অসীম অভাব পূরণের জন্য সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে। আধুনিক অর্থনীতিবিদ লায়নেল রবিনস (Lionel Robbins) -এর ভাষায়, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য অপ্রচুর সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে।"[৩] অধ্যাপক রবিনস সংক্ষেপে অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' বলেছেন।

সুতরাং, মানুষ কীভাবে তার অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে এবং কীভাবে সে তার সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অসীম অভাব পূরণের চেষ্টা করে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি তা আলোচনা করে।

১.১.৫ অর্থনীতির সংজ্ঞা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়

অর্থনীতির সংজ্ঞা আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা যায়। অর্থনীতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আরো সহজভাবে বোঝার জন্য এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

মানুষের অভাব অসংখ্য : মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। একটি দুটি অভাব পূরণ হলে আরো নতুন নতুন অভাব দেখা দেয়। যেমন, এক জন মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি প্রাথমিক পর্যায়ের অভাব পূরণ হলে সে আরো ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন রকম দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে চাইবে। ক্রমশ সে ব্যক্তি উৎকৃষ্টতর দ্রব্য সামগ্রীর অভাব অনুভব করবে। এভাবে মানুষের জীবনে অভাবের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

অভাব পূরণের উপকরণ অপ্রতুল : সমাজের প্রত্যেক মানুষের কাছে অভাব পূরণের উপকরণ বা সম্পদ সীমিত। অর্থাৎ অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ দরকার তা মানুষ পায় না। কেবল দরিদ্র লোকই নয়, খুব ধনবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি একটি সমস্যা। সাধারণ লোকের চেয়ে ধনী লোকের অভাবের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কাজেই সমাজের যে কোনো ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র বা সরকারের ক্ষেত্রেও অভাবের তুলনায় সম্পদ সবসময় অপ্রতুল।

সীমিত সম্পদ দ্বারা সীমাহীন অভাব পূরণ : সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে সীমাহীন অভাব পূরণ করা যায়, তা সমাজের প্রত্যেক মানুষের সমস্যা। এক ব্যক্তির কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে টাকা-পয়সা থাকে তা দিয়ে সে তার সব অভাব পূরণ করতে পারে না। এ অবস্থায় সে তার অনেক অভাবের মধ্যে বেশি জরুরি অভাবগুলো বাছাই করে এবং সীমিত সম্পদ দিয়ে তা আগে পূরণ করে। অন্য অভাবগুলো পরবর্তী সময়ে পূরণের জন্য রেখে দেয়।

সম্পদের বিকল্প ব্যবহার : যেহেতু অভাবের তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল, সেজন্য কোনো এক সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ

১."Economics is a science that enquires into the nature and causes of the wealth of nations."-Adam Smith

২. "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life." - Alfred Marshall

৩. "Economics is a science which studies human behaviour as relationship between ends and scarce means which have alternative uses." - Prof. L. Robbins

দ্বারা এক ব্যক্তি তার সব অভাব এক সঙ্গে পূরণ করতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি সীমিত সম্পদকে তার নির্বাচিত অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। ধরা যাক, এক ব্যক্তির একই সময়ে একটি সাইকেল ও একটি বৈদ্যুতিক পাখা দরকার। তার কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে সাইকেল অথবা পাখা যে কোনো একটি কেনা যায়, একসঙ্গে দুটো নয়। ঐ ব্যক্তি সাইকেলটি বেশি দরকারি মনে করলে তার সীমিত অর্থ সাইকেল কেনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। সে ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক পাখার অভাব আপাতত অপূর্ণ থেকে যাবে। এভাবে সীমিত সম্পদ একটি অভাবের পরিবর্তে অন্য একটি অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করাকে সম্পদের বিকল্প ব্যবহার বলে। কৃষি ক্ষেত্রে একখণ্ড জমি পাট চাষে ব্যবহার না করে বিকল্পভাবে ধান চাষের জন্য ব্যবহার করা যায়।

১.১.৬ অর্থনীতির বিষয়বস্তু

অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধির প্রসার ঘটেছে। নিচে অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি আলোচনা করে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত যেসব কাজকর্ম করে সেগুলোই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। যেমন, সন্তানের জন্য মাতাপিতার স্নেহ ও সেবা অর্থনীতির আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু হাসপাতালের বেতনভোগী সেবিকা অর্থের বিনিময়ে যে সেবা দেয়, তা অর্থনীতির আওতাভুক্ত। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস বলেন, "মানুষের কার্যাবলির যে অংশ অর্থের সঙ্গে জড়িত, অর্থনীতি তাই আলোচনা করে।"[৪]

২. মানুষের অভাব মোচনের জন্য সম্পদের প্রয়োজন। সুতরাং সম্পদ প্রাপ্তি ও তার ব্যবহার অর্থনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়। অর্থনীতির জনক এ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলেছেন।

৩. মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। মানুষ কীভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে অফুরন্ত অভাবের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কতিপয় অভাব মোচন করে সর্বাধিক তৃপ্তি পায় তা আলোচনা করাই অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। সুতরাং অর্থনীতির বিষয়বস্তু হিসেবে সম্পদের স্বল্পতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. অর্থনীতি মানব কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা কীভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ হয়, তা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

৫. মানুষের অভাব পূরণের সঙ্গে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ বিশেষভাবে জড়িত। আবার মুদ্রা, ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারি আয় ব্যয়, বাণিজ্য প্রভৃতিও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ। অর্থনীতি এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা যায়, সে বিষয়ও অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়।

৬. অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেরও পথ নির্দেশ করে। মানুষের কাজের ভালোমন্দ নিয়েও অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, অর্থনীতির বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। তাই অধ্যাপক ভাইনার (Viner) যথার্থই বলেন, "অর্থনীতিবিদগণ যা আলোচনা করেন, তা অর্থনীতির আওতাভুক্ত।"

১.১.৭ অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিককালে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শুধু জ্ঞান অর্জনই নয়, অর্থনীতি আমাদের বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হল :

১. মানুষের দৈনন্দিন জীবন : দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে বহুমুখী অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এসব অভাব পূরণের

৪. "Economics studies the part played by money in human affairs."- Cairncross

সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে অসংখ্য অভাবের মধ্যে বাছাইকৃত অভাবকে পূরণ করা যায় তা অর্থনীতি পাঠ করে মানুষ জানতে পারে।

২. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার : অর্থনীতির জ্ঞান থেকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শেখা যায়। দেশের সীমিত সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করলে উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হবে এবং জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে তা অর্থনীতি পাঠ করে জানা যায়।

৩. ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির কাছে : ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা, যোগান, দাম নির্ধারণ, ঝুঁকি গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমস্যা দেখা দেয়। অর্থনীতি বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রয়োগ করে ব্যবসায়ীরা এসব সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৪. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে : রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অর্থনীতি বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান অপরিহার্য। এ জন্য দেশের মুদ্রা, ব্যাংক ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য নীতি, বাজেট প্রণয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থনীতি বিষয়ের জ্ঞান রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করে।

৫. সমাজকর্মীদের কাছে : দেশের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি সমস্যার কারণ নির্ণয় ও সমাধানের জন্য সমাজকর্মীদের অর্থনীতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৬. শ্রমিক নেতাদের কাছে : শ্রমিক সংঘ গঠন, শ্রমিকদের মজুরি ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, কাজের শর্তাবলির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে দর কষাকষির জন্য শ্রমিক নেতাদের অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৭. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে : অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ও প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা থাকা দরকার। এ জন্য অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

৮. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় জানতে ও বুঝতে হলে অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৯. বুদ্ধি বৃত্তির চর্চা ও নাগরিক গুণাবলি অর্জন : অর্থনীতি পাঠে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ ঘটে। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও সুনাগরিকের গুণাবলি বিকাশ লাভ করে।

সুতরাং মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই অর্থনীতিবিদ বারবারা উটন যথার্থই বলেন, "অর্থনীতি বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে সুনাগরিক হতে পারে না।"

১.১.৮ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জনসংখ্যার আধিক্য, খাদ্য ঘাটতি, কৃষি ও শিল্পের অনুন্নতি, মূলধনের স্বল্পতা প্রভৃতি সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যার সঠিক কারণ নির্ণয় এবং তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। এ দেশে কীভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা যায়, কীভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষি ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তা জানার জন্য অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সর্বস্তরের জনসাধারণকে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সচেতন করে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাহলে তারা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবে।

উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমস্যা বেশি। তাই এসব সমস্যা সমাধানের জন্য এ দেশে অর্থনীতির

পাঠের গুরুত্বও বেশি। আমাদের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এ জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা, ব্যবসায় বাণিজ্য, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অর্থনীতির জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.২.১ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলি

মানব জীবনে অভাবের শেষ নেই। একটি অভাব পূরণ হলে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক অভাব দেখা দেয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো প্রাথমিক স্তরের অভাবগুলো পূরণ হলে মানুষ আরো ভালো খাদ্য বস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক জিনিসের অভাব বোধ করে এবং এসব অভাব পূরণ করে তৃপ্তি পেতে চায়। কিন্তু এ অফুরন্ত অভাব পূরণের সম্পদ বা উপকরণ অপ্রচুর। সম্পদের স্বল্পতার জন্য মানুষ তার সব অভাব একসঙ্গে পূরণ করতে পারে না। অপ্রচুর সম্পদ দ্বারা অসংখ্য অভাব পূরণ করতে গিয়ে মানুষ দুটো মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যথা- ১. সম্পদের স্বল্পতার সমস্যা ও ২. অভাবের নির্বাচন সমস্যা।

১. সম্পদের স্বল্পতার সমস্যা : মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ হল সম্পদের স্বল্পতা। ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ অপ্রচুর। অসীম অভাবের সাথে সাথে যদি সম্পদও ইচ্ছামতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত, তবে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হত না। সুতরাং সম্পদের স্বল্পতা থেকেই অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি।

২. **অভাবের নির্বাচন সমস্যা :** অভাব বেশি এবং সম্পদ কম। এ কারণে একই সময়ে মানুষ তার সব অভাব এক সঙ্গে পূরণ করতে পারে না। এ অবস্থায় মানুষকে চিন্তা করতে হয় সে তার অনেক অভাবের মধ্যে কোনগুলো আগে পূরণ করবে এবং কোনগুলো পরে। এক্ষেত্রে অভাবের নির্বাচন বা বাছাইয়ের সমস্যা দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তার বেশি গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলো বাছাই করে সীমিত সম্পদ দ্বারা তা আগে পূরণ করে। এভাবে অভাবের নির্বাচন বা বাছাই একটি মৌলিক সমস্যারূপে দেখা দেয়।

সম্পদের স্বল্পতা এবং অভাবের নির্বাচন -এ দুটো প্রধান সমস্যা থেকে সমাজে আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলো হল-

ক. কী উৎপাদন করতে হবে?

খ. কীভাবে উৎপাদন করতে হবে ?

গ. কার জন্য উৎপাদন করতে হবে ?

ক. কী উৎপাদন করতে হবে : সীমাবদ্ধ সম্পদ দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য এক সঙ্গে উৎপাদন করা যায় না। সে জন্য আগে কোন কোন দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদন করা হবে এবং কোনগুলোর উৎপাদন স্থগিত রাখা হবে সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে অভাবগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব, জনসাধারণের চাহিদা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

খ. কীভাবে উৎপাদন করতে হবে : নির্বাচিত দ্রব্যসামগ্রী কীভাবে উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করাও একটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। একই দ্রব্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন, একটি নির্দিষ্ট পণ্য কম মূলধন ও বেশি শ্রম অথবা বেশি মূলধন ও কম শ্রম দিয়ে উৎপাদন করা যায়। এখন দ্রব্যটি কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে, তা নির্ভর করে দেশে মূলধন ও শ্রমের যোগান ও তাদের আপেক্ষিক দাম এবং উৎপাদনের কলাকৌশলের ওপর।

গ. কার জন্য উৎপাদন করতে হবে : দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিই সমাজের একমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। কার জন্য উৎপাদন করা হবে, অর্থাৎ সমাজের উৎপাদিত পণ্যাদি কে বা কারা কী পরিমাণে ভোগ করবে তা নির্ধারণ করাও একটি সমস্যা। উৎপাদিত দ্রব্যাদি সমাজের মানুষের মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত যেন সমাজের কল্যাণ বাড়ে।

১.২.২ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

প্রত্যেক সমাজেই প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল। এ অপ্রতুল সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে সমাজের সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে এমনভাবে সম্পদ নিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে স্বল্পতম ব্যয়ের দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়। একেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বলে। সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দরকার।

আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ অপর্যাপ্ত। এই অপ্রতুল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হলে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। যেমন, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করে একটি পার্ক না করে আগে একটি রাস্তা নির্মাণ করা উচিত। আবার আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস ইট পোড়ানোর কাজে না লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা উচিত। কারণ পার্ক অথবা ইট দিয়ে অট্টালিকা তৈরির চেয়ে রাস্তা নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশি প্রয়োজন। এভাবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনেও বেশি জরুরি অভাবগুলো আগে পূরণ এবং সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভের জন্য সীমিত সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

১.২.৩ দাম ব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর কোনো সরকারি বিধি নিষেধ বা হস্তক্ষেপ থাকে না। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন্ দ্রব্য কীভাবে এবং কী পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা নিজ নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করে। ভোগের ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্য কতটুকু ভোগ করা হবে তা ভোক্তা বা ক্রেতারা নিজস্ব ইচ্ছা, পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী স্থির করে। সেক্ষেত্রে কোনো সরকারি নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ধনতান্ত্রিক সমাজের এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আপাত দৃষ্টিতে শৃঙ্খলাহীন মনে হলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে তা একটি 'অদৃশ্য শক্তি' দ্বারা সুষ্ঠু ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। এ অদৃশ্য শক্তিই হল দাম ব্যবস্থা। অবাধ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি হল চাহিদা ও যোগান। বাজারে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের যৌথ শক্তি দ্বারা দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বলে। যেমন, বাজারে কোনো দ্রব্যের যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি হলে তার দাম বাড়ে। আবার চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হলে দাম কমে। এভাবে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হলে সে অবস্থায় তার দাম নির্ধারিত হয়। আবার কোনো কারণে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা না থাকলে দামের পরিবর্তন হয়। ধনতন্ত্রে উৎপাদনকারী মুনাফার জন্য উৎপাদন করে। কাজেই উৎপাদনের পরিমাণ দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। আবার ভোক্তার ভোগের পরিমাণও দ্রব্যের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো দ্রব্যের দাম কমলে ভোক্তা দ্রব্যটি বেশি ভোগ করবে এবং দাম বাড়লে কম ভোগ করবে। এভাবে দাম ব্যবস্থা ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে পরিচালনা করে থাকে।

১.২.৪ দাম ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

প্রথমত, ধনতন্ত্রে উৎপাদন পরিচালিত হয় মুনাফা লাভের আশায়। দ্রব্যের দাম বেশি হলে উৎপাদনকারী বেশি উৎপাদন ও বেশি বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হলে দ্রব্যের দাম কমে যায়। এতে মুনাফা কম হয় এবং এ কারণে উৎপাদন হ্রাস পায়। অবশ্য দীর্ঘকালে কম দামের দ্রব্যের দাম বাড়তে পারে এবং বেশি দামের দ্রব্যের দাম কমতে পারে। এভাবেই ধনতন্ত্রে কোন দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা দ্রব্যগুলোর দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয়ত, কীভাবে দ্রব্য উৎপাদিত হবে তাও নির্ধারিত হয় দাম ব্যবস্থার দ্বারা। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপাদান (ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি) দাম দিয়ে কিনতে হয়। কাজেই দেশে মূলধনের চেয়ে শ্রমের দাম কম হলে উৎপাদনকারী তার দ্রব্য উৎপাদনে মূলধন অপেক্ষা বেশি শ্রম নিয়োগ করবে। এতে তার উৎপাদন ব্যয় কম এবং মুনাফা বেশি হবে।

তৃতীয়ত, কার জন্য উৎপাদিত হবে অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য কে কতটুকু ভোগ করবে তা দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। সাধারণ নিয়মে দাম বাড়লে ভোগ কমে এবং দাম কমলে ভোগ বাড়ে। ভোগ ও চাহিদা কমলে সে দ্রব্যের উৎপাদন কমবে এবং ভোগ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। এভাবে দাম ব্যবস্থা দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ ও ভোগের মাধ্যমে

উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় কোন দ্রব্য, কতটুকু, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে এসব মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার দ্বারা সমাধান হয়।

১.২.৫ পরিকল্পনা

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। কারণ পরিবার, সমাজ অথবা দেশ যে কোনো ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা ছাড়া সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন কোনটাই সম্ভব নয়। এ জন্যই বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সহজ ভাষায় বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য যে পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে। ধরা যাক, বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কয়েকটি শিল্প কারখানা, স্কুল, কলেজ, গবেষণা কেন্দ্র, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও বিশেষ বিশেষ স্থানে রাস্তা, সেতু, রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ বা মেরামত করতে হবে। কৃষি উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এসব উন্নয়নমূলক কাজের সুনির্দিষ্ট তালিকা, অর্থসংস্থান ও ব্যয় বরাদ্দ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক রূপরেখা প্রণয়ন করাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে। অধ্যাপক রবিনস-এর মতে, "পরিকল্পনার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কাজ করা ও পছন্দ করা এবং এ পছন্দই হল অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল বিষয়।"[৫]

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে স্বল্প উৎপাদন, সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব, অনুন্নত অবকাঠামো, এ রকম নানা সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৩.১ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

বিশ্বের সবদেশেই মানুষের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জন। কোন পদ্ধতিতে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে তা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। যেসব অর্থনৈতিক নিয়মকানুন ও পরিবেশের দ্বারা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়েক প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। যেমন, ক. ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা, খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা, গ. মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা এবং ঘ. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা।

১.৩.২ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা

এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তি মালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগসহ সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয় করে। ভোগের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই এ ধরনের অর্থ ব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতিও বলে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে বর্ণনা করা হল :

১. সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা : ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় জমি, কলকারখানা ও অন্যান্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। ব্যক্তি তার সম্পত্তি অবাধে ভোগ দখল ও হস্তান্তর করতে পারে।

২. বেসরকারি উদ্যোগ : এ সমাজে সকল ব্যক্তি তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন, কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি কাজকর্ম করে সম্পদ অর্জন করে। বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে কোনো সরকারি হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

---

৫. "To Plan is to act with a purpose, to choose and choice is the essence of economic activities."- L. Robbins

৩. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা : ধনতন্ত্রে সব অর্থনৈতিক কাজ স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। চাহিদা ও যোগান দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় এবং এ দামের ভিত্তিতেই উৎপাদন ও ভোগ কার্য চলে।

৪. ভোক্তার স্বাধীনতা : প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব সামর্থ্য, ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো দ্রব্য অবাধে ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা অনুসারে উৎপাদনকারী দ্রব্য উৎপাদন করে।

৫. অবাধ প্রতিযোগিতা : ধনতন্ত্রে অসংখ্য উৎপাদনকারীর মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চলে। এতে দ্রব্যের দাম কম হয় এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।

৬. মুনাফা অর্জন : ধনতন্ত্রে যাবতীয় উৎপাদনের লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন। বেশি মুনাফার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেশি হয়। এর ফলে কোনো কোনো দ্রব্যের বেশি উৎপাদন এবং অন্য ক্ষেত্রে কম উৎপাদন হতে পারে।

সুতরাং ধনতান্ত্রিক বা মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় দেশের উৎপাদন কার্য, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কাজকর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলে। কোনো প্রকার সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

১.৩.৩ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা

এ ব্যবস্থায় জমি, কলকারখানা, খনি ও অন্যান্য সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় উৎপাদন, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেই। এখানে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে। দেশে কোন কোন দ্রব্য কী পরিমাণে ও কীভাবে উৎপাদিত হবে এবং কীভাবে বন্টন করা হবে এসবই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না। সার্বিক সামাজিক চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র পতনের পরও পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা চালু আছে। সবদেশে সমাজতন্ত্রের রূপ একরকম নয়। তবে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হল :

১. সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা : প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি, কলকারখানা, খনি ও অন্যান্য সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে। দেশের জনগণ বা রাষ্ট্র সব সম্পদের মালিক। এসব সম্পদ থেকে যে আয় হয় তা সমাজের জন্য ব্যয় করা হয়।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুপস্থিতি : উদ্যোগ বলতে উৎপাদন বা ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে বোঝায়। সমাজতন্ত্রে সব সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। কাজেই শিল্প কারখানা স্থাপন, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকে না। এর ফলে কোনো ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনেরও সুযোগ নেই। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মকাড পরিচালিত হয়।

৩. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা : প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাড কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হয়। দেশে কোন কোন দ্রব্য কী পরিমাণে এবং কী পদ্ধতিতে উৎপন্ন হবে তা ঐ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে।

৪. **ভোক্তার স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা :** সমাজতান্ত্রিক দেশে কেবল সরকারি উদ্যোগে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও আমদানি করা হয়। এ জন্য এখানে ভোক্তা তার ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করে যে কোনো রকম দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভোগ করতে পারে না। তাই বলা হয়, সমাজতন্ত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা সীমিত।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। কোনো দ্রব্য কতটুকু এবং কীভাবে উৎপাদিত হবে তা সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন কার্য, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কাজ সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে, কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকে না।

১.৩.৪ মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা

যে অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি মালিকানা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে, তাকে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা বা মিশ্র অর্থনীতি বলে। এ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এখানে ধনতন্ত্রের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প কারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় বাণিজ্য সরকারি খাতে পরিচালনা করা হয়। মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল :

১. সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহঅবস্থান : এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পত্তির বেসরকারি মালিকানা ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা যেমন স্বীকৃত, তেমনি পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিছু কিছু শিল্পকারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত হয়। যেমন, বাংলাদেশে সরকারি খাতের প্রাধান্য থাকলেও বহুসংখ্যক বড় শিল্প কারখানা এবং কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে।

২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ : ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত উৎপাদন, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সরকারি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বিশেষ করে একচেটিয়া ব্যবসার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

৩. দাম ব্যবস্থা : মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের মতো স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন ও ভোগ নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই দাম ব্যবস্থা কোনো ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ দ্বারা আংশিক নিয়ন্ত্রিত।

৪. ভোক্তার স্বাধীনতা : মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়। ভোক্তা তার সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী তা ভোগ করে। তবে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সরকার অনেক সময় বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. মুনাফা অর্জন : এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতার দরুন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য কার্যকর থাকে। তবে সরকার জনকল্যাণের কথা মনে রেখে দাম ও মুনাফা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় কলকারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারি ও সরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগ পাশাপাশি চালু থাকে। এসব কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে অবাধ নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ থাকে। তবে মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা এ ব্যবস্থায় স্বীকৃত।

১.৩.৫ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের সামগ্রিক সমস্যাবলির সমাধান নিহিত রয়েছে ইসলামী জীবন বিধানে। যে অর্থ ব্যবস্থায় আল্লাহতায়ালার দেওয়া বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয় তাকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বলে। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের জীবনের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশের আলোচনা নয়, বরং এটি জীবনের সামগ্রিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আকাশমন্ডল ও মাটির মালিকানা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর এ মালিকানার প্রেক্ষিতে আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানুষ উৎপাদন, রুজি সংগ্রহ এবং সম্পদের বণ্টন ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করবে।'[৬] এটাই ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. সমগ্র বিশ্ব ও মানুষের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ সব দ্রব্যসামগ্রী ও বস্তুসম্পদ সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। তাই এ ব্যবস্থায় আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মানুষের রুজি রোজগার ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলে।

২. এ অর্থ ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষকে মর্যাদা ও জীবিকা অর্জনের অধিকার দেওয়া হয়। কাজেই সেখানে মানুষের মধ্যে কোনো বিরোধ, পার্থক্য ও বৈষম্যের অবকাশ থাকে না।

---

৬. পবিত্র কোরআনের ১ম পারা 'সুরা বাকারা' (১০৭ আয়াত)

৩. এ ব্যবস্থায় সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তুগত সম্পদকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

৪. এ অর্থ ব্যবস্থায় বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে নৈতিক উন্নতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের পথ নির্দেশ করা হয়।

৫. ইসলামী বিধান মতে, সবরকম মৌলিক সম্পদের মালিক আল্লাহ। এই সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে স্রষ্টার আমানতদার মনে করে। এ জন্যই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানুষের চরিত্রে দুর্নীতি ও অহংকার সৃষ্টি করে না।

৬. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সাধারণভাবে শ্রম ছাড়া কোনো অর্থনৈতিক অধিকার বা ভোগের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। পবিত্র কুরআনে পুরুষ ও নারীকে শ্রমের বিনিময়ে ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাসূলে করীম (স) শ্রমকে খুব উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। নবী করীম (স) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কোনোদিন খায়নি।'[৭]

৭. এ ব্যবস্থায় অপচয় ও বিলাসের সমর্থন নেই। অন্যায় পথে রুজি অর্জন ও ধনসম্পদ বৃদ্ধিকে ইসলাম সমর্থন করে না। তবে সমাজের দুস্থ, অসহায় এবং কর্মক্ষম নয় এমন ব্যক্তিদের বিনাশ্রমে আর্থিক সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে। এটা একদিকে সমাজের আয় বৈষম্য হ্রাসে এবং অন্যদিকে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হচ্ছে।

৮. সম্পদ ও আয় যাতে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত না হয় সে উদ্দেশ্যে সম্পদ ও সঞ্চিত আয়ের শতকরা ২ $\frac{১}{২}$ টাকা হারে যাকাত ও উশর[৮] বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে। এ খাতে সংগৃহীত অর্থ সমাজের দরিদ্র, দুস্থ ও কর্মে অক্ষম লোকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৯. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক লেনদেন হারাম। বৃহদাকার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে পাওয়া যায়।

সুতরাং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সমাজের জন্য কল্যাণকর ও শোষণহীন। উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল হালাল ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা। এ জন্যই পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ইসলামী উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন আলাদা।

১.৪.১ অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত অর্থনীতি

পৃথিবীর সবদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একরকম নয়। কোনো কোনো দেশ শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক উন্নত এবং তাদের জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি ও জীবনযাত্রার মান উঁচু। আবার অনেক দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর। তাদের মাথাপিছু আয় কম ও তাদের জীবনযাত্রার মান নিচু। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা ও স্তরের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা ক. অনুন্নত দেশ, খ. উন্নয়নশীল দেশ এবং গ. উন্নত দেশ।

ক. অনুন্নত দেশ

যেসব দেশে প্রকৃত অর্থে কোনো অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি এবং জনগণের মাথাপিছু আয় কম ও জীবনযাত্রার মান নিচু, সেসব দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। এ ধরনের অর্থনীতিতে প্রাথমিক পেশার প্রাধান্য বেশি, মূলধন স্বল্প, বেকারত্ব বেশি এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা অনেকাংশে অপূর্ণ থাকে। অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্কের মতে, অনুন্নত দেশের অধিকাংশ জনগণ প্রাথমিক পেশার কার্যাবলি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

---

৭. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯, ১৯২৭ নম্বর হাদিস।

৮. উশর হলো একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে বিভিন্ন সম্পদের ওপর বিভিন্ন হারে আরোপিত এবং সেই অনুসারে সংগৃহীত অর্থ।

অনুন্নত দেশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণনা করা হল :

১. স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান : অনুন্নত দেশসমূহে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বল্প উৎপাদনের জন্য জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু। অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

২. কৃষির ওপর অতিনির্ভরতা : অনুন্নত দেশের অর্থনীতি বেশিমাত্রায় কৃষি নির্ভর। এসব দেশে শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অন্যান্য পেশা উন্নত না হওয়ায় অধিকাংশ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেশের কৃষি ব্যবস্থাও অনুন্নত এবং কৃষির একর প্রতি ফলন উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম।

৩. শিল্পের অনুন্নতি : অধিকাংশ অনুন্নত দেশ দীর্ঘকাল যাবত বিদেশি শাসনের অধীনে ছিল। তাই এসব দেশে শিল্প কারখানা খুব কমই স্থাপিত হয়েছে। ফলে এসব দেশ শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত হতে পারেনি।

৪. স্বল্প মূলধন : অনুন্নত দেশে স্বল্প আয়ের ফলে জনগণের সঞ্চয় কম। এ জন্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল, কারখানার দালানকোঠা ইত্যাদি মূলধন দ্রব্য তৈরির জন্য যে পর্যাপ্ত অর্থ প্রয়োজন তা পাওয়া যায় না। কাজেই এসব দেশে মূলধনের স্বল্পতা থাকে যে কারণে শিল্প কারখানা স্থাপন ব্যাহত হয়।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার : অনেক অনুন্নত দেশে কৃষি, বন, মৎস্য, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও তার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না।

৬. ব্যাপক বেকারত্ব : বেশিরভাগ অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। কিন্তু শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশা উন্নত না হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। কাজেই এসব দেশে ব্যাপক বেকারত্ব বিরাজ করে।

৭. কারিগরি জ্ঞানের অভাব : অনুন্নত দেশে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদির অভাবে শ্রমিকের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা কম। এর ফলে শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৮. অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : অনুন্নত দেশে পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে রাস্তাঘাট, রেলপথ, বাঁধ, সেতু, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, ডাক, তার, টেলি যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন করা যায় না। এ কারণে সমগ্র পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত দেশের তুলনায় অনেক অনগ্রসর।

৯. নিরক্ষরতা : ব্যাপক নিক্ষরতা অনুন্নত দেশের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এসব দেশে শতকরা প্রায় ৭০/৮০ ভাগ লোক নিরক্ষর। তবে বর্তমানে এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা বিস্তারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

১০. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অতিনির্ভরতা : অনুন্নত দেশেসমূহ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তাদের নিজস্ব সম্পদের অভাব রয়েছে। তাই এসব দেশে অতিমাত্রায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে।

১১. প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ : অনুন্নত দেশে দীর্ঘকাল যাবত অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুন্নতি ইত্যাদি বিদ্যমান। ফলে এরূপ দেশের সামাজিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পূর্ণ সহায়ক নয়।

বর্তমান বিশ্বে অনুন্নত দেশগুলো তাদের নিজস্ব তাগিদে এবং অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এসব দেশ ইতোমধ্যে কিছুটা উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়েছে। তাই বর্তমান কালে প্রকৃত অর্থে অনুন্নত দেশের সংখ্যা খুব কম। ইথিওপিয়া, মালে, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশকে এখনো অনুন্নত দেশ বলা যায়।

খ. উন্নয়নশীল দেশ

যেসব দেশে পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান

ক্রমশ বাড়ছে সেগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। এসব দেশে উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে এবং দেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত দেশের তুলনায় নিচু হলেও তা বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতা : উন্নয়নশীল দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলেও তা বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশে বিগত পাঁচ বছরে জনগণের আয় প্রায় ৫০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. উন্নয়ন কর্মসূচির গতিশীলতা : উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অব্যাহতভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ফলে এসব দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বিরাজ করে।

৩. কৃষি ও শিল্পের ক্রম উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা উন্নত দেশের মতো উন্নত নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলি সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হয়। ফলে সেখানে ক্রম উন্নতির ধারা সৃষ্টি হয়।

৪. **বেকারত্ব** ও ধনবৈষম্য : উন্নয়নশীল দেশ উন্নয়নের পথে পা বাড়ালেও সেখানে বহু অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য কাঙ্ক্ষিত হারে উন্নত হয় না। ফলে সেখানে বেকার সমস্যা থাকে। বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হওয়ায় ধনবৈষম্যও থাকে।

৫. পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা : উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে চায়। এ জন্য এসব দেশে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৬. আর্থ-সামাজিক সমস্যা : উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও পাশাপাশি নানা রকম আর্থ-সামাজিক সমস্যা থাকে। যেমন, কৃষি ও শিল্পের অনুন্নতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, নিরক্ষরতা প্রভৃতি। এসব সমস্যার সমাধানে অনেক সময় লাগে।

৭. সামাজিক পরিবেশের ক্রম উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন ও আয় বাড়ে। শিক্ষা ও নগরায়ণের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে ধীর গতিতে হলেও সামাজিক পরিবেশে ক্রম উন্নতি ঘটে।

ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ভুক্ত।

গ. উন্নত দেশ

যেসব দেশে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু, সেসব দেশকে উন্নত দেশ বলা হয়। এসব দেশে পর্যাপ্ত মূলধন ও উন্নত কারিগরি জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বেশি, বেকারত্বের হার নগণ্য। নিত্যব্যবহার্য ও বিলাসজাত দ্রব্যের যোগান প্রচুর। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদির পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এসব দেশে বিদ্যমান।

উন্নত দেশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণনা করা হল :

১. উচ্চ মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান : উন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় অনেক বেশি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত। যেমন, বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ৫২০* ডলার, ভারতে ৮২০** ডলার এবং পাকিস্তানে ৭৭০** ডলার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে তা ৩৬০০০ ডলারেরও বেশি।

২. ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন : উন্নত দেশসমূহ ব্যাপকভাবে শিল্প সমৃদ্ধ। এসব দেশের জাতীয় আয়ের বৃহদাংশ শিল্প থেকে আসে। এদের রপ্তানি বাণিজ্যের বেশিরভাগ হল শিল্প দ্রব্য।

---

* বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক–২০০৭
** http://www.finfacts.com/biz10/globalworldincomepercapita.htm

৩. মূলধনের প্রাচুর্য : উন্নত দেশে মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বেশি। ফলে পর্যাপ্ত মূলধনের জন্য এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৪. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার : উন্নত দেশে পর্যাপ্ত মূলধন ও প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। ফলে মোট উৎপাদন বেশি হয়।

৫. উন্নত কারিগরি জ্ঞান : উন্নত দেশে কারিগরি জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ফলে শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

৬. উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : উন্নত দেশগুলোতে সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পরিবহন এবং যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ অনেক উন্নত। এর ফলে জনগণের জীবনযাত্রায় ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সুবিধা বাড়ে।

৭. শিক্ষার হার বেশি : উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার অনেক বেশি। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশে শিক্ষার হার প্রায় ৯৮% থেকে ১০০%।

৮. দক্ষ জনশক্তি : উন্নত দেশে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা প্রভৃতির পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে অধিকাংশ জনশক্তি উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন। ফলে শিল্পের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

৯. জনসংখ্যার চাপ কম : প্রায় সব উন্নত দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। এসব দেশে জনসংখ্যার চাপ না থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রমে সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

১০. উন্নত সামাজিক পরিবেশ : উন্নত দেশে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষা ও নগরায়ণের উচ্চ হার, জীবনযাত্রার উচ্চ মান প্রভৃতি কারণে সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা নেই। অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের সহায়ক।

যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ উন্নত দেশের পর্যায়ভুক্ত। এসব দেশের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় প্রায় ৩৫ হাজার থেকে ৪৫ হাজার ডলারের মধ্যে। অথচ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মাত্র ৫২০ থেকে ৮২০ ডলারের মধ্যে।

১.৪.২ বাংলাদেশ একটি অনুন্নত না উন্নয়নশীল দেশ ?

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৃষি প্রধান দেশ। এখানে স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান, কৃষি ও শিল্পের অনুন্নতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারত্ব, খাদ্যঘাটতি ও অপুষ্টি, পুঁজির স্বল্পতা, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়াও এ দেশে শিক্ষার হার কম, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বিশৃংখলা বিদ্যমান। এসব বিষয়ের আলোকে বাংলাদেশকে একটি অনুন্নত দেশ মনে করা যায়।

বাংলাদেশে প্রায় তিন দশক ধরে পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই দেশে উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে। সমস্যা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা এসেছে। অত্যন্ত ধীরে হলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো হলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যায়। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ যেমন, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মিসর প্রভৃতির তুলনায় এ দেশের মাথাপিছু আয় ও উন্নয়নের হার অনেক কম। বাংলাদেশসহ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় নিম্নরূপ :

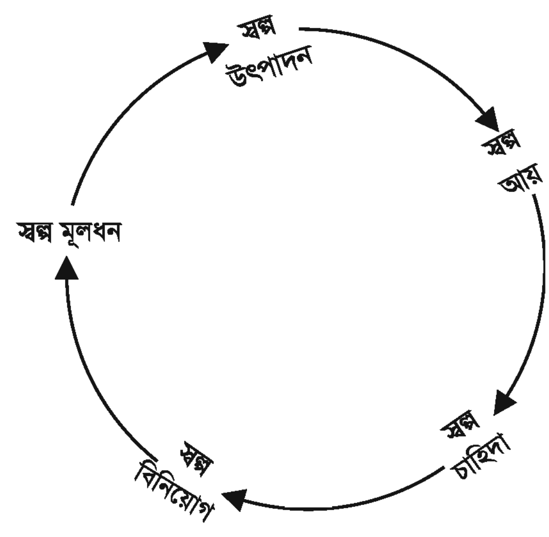
দেশ	মাথাপিছু আয় (ডলার)
১. ইন্দোনেশিয়া	১৪২০
২. মালয়েশিয়া	৫৪৯০
৩. ফিলিপাইন	১৪২০
৪. থাইল্যান্ড	২৯৯০
৫. শ্রীলংকা	১৩০০
৬. বাংলাদেশ	*৫২০

উৎস : http://www.finfacts.com/biz10/globalworldincomepercapita.htm এবং
* বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক–২০০৭

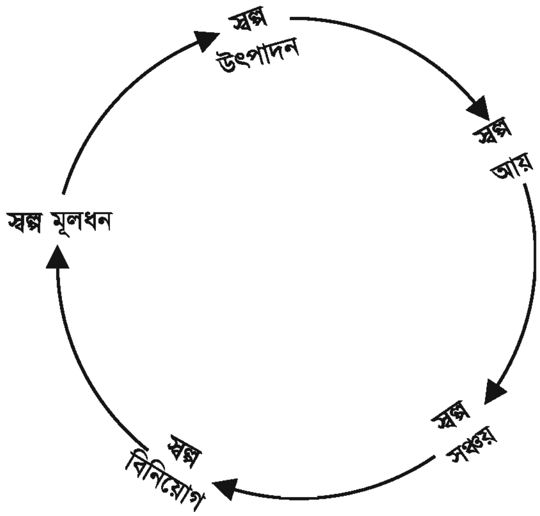
১.৪.৩ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

পৃথিবীর অনুন্নত ও অনেক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হল দারিদ্র্য। এসব দেশে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হলেও নানা রকম অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে। সেখানে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' নামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করে যা দেশের উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস বলেন, "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হল এমন কতিপয় শক্তির একত্রীকরণ যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দেশকে দরিদ্র করে রাখে।" নার্কসের মতে, "একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দরিদ্র।" [A country is poor because it is poor] দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাকে মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগান উভয় দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

মূলধনের চাহিদা : দেশে উৎপাদন কম হলে জনগণের আয় কম হয়। আয় কম বলেই লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম এবং সে জন্য বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কম। দ্রব্যের স্বল্প চাহিদার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ কম। বিনিয়োগ অল্প বলে মূলধনের চাহিদা ও তার ব্যবহার কম। এ কারণে আবার উৎপাদন কম। নিচের রেখাচিত্রে এই চক্রটি দেখান হল :



মূলধনের যোগান : স্বল্প উৎপাদনের কারণে স্বল্প আয়। আয় কম বলে জনগণের সঞ্চয় কম। কম সঞ্চয়ের জন্য কম বিনিয়োগ, কম বিনিয়োগের জন্য মূলধনের যোগান কম হয়। মূলধনের অভাবে আবার উৎপাদন ও আয় কম। রেখাচিত্রে এটি দেখান হল :



চিত্রে দেখা যায় দারিদ্র্যের চক্রটি আপন বৃত্তে আবর্তিত হয়ে দরিদ্র দেশকে দরিদ্র করে রাখে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

বাংলাদেশে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' বিদ্যমান। এখানে প্রধানত স্বল্প মূলধন ও স্বল্প উৎপাদন ভিত্তিক দারিদ্র্যচক্র সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ও আয়ের স্বল্পতা থেকে স্বল্প চাহিদা ও স্বল্প বিনয়োগ হয়। এর ফলে আবার মূলধনের অভাব ও কম উৎপাদন হয়।

দুষ্টচক্র হতে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিপুল পরিমাণ মূলধন উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করতে হবে। এ জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বেশি বাড়াতে হবে যাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এর ফলে আবার সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। তবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১.৫.১ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ

উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত এমন কিছু প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে যেগুলোর জন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ ধরনের সমস্যাকেই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বলে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও কতিপয় অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। নিচে এসব সমস্যা বর্ণনা করা হল :

১. কৃষির অনুন্নতি : বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এ দেশের প্রায় ৭৫ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সনাতন চাষ পদ্ধতি এবং সেচ, সার, বীজ, কৃষিঋণ প্রভৃতির অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে আমাদের কৃষি উৎপাদন উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। তবে কিছুদিন যাবত আমাদের দেশে কৃষিতে সীমিত আকারে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বেড়েছে।

২. শিল্পের অনুন্নতি : প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উদ্বৃত্ত জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও মূলধন, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, দক্ষ শ্রমিক, উন্নত অবকাঠামো ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রভৃতির অভাবে এ দেশের শিল্প উন্নয়নের গতি খুব মন্থর। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান মাত্র *২৯.৬৬% ভাগ। কৃষি ও শিল্পের অনুন্নতির জন্য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম নয়। তবে সাম্প্রতিককালে আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে তৈরী পোশাকশিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮

৩. স্বল্প মাথাপিছু আয় : কৃষি ও শিল্পে স্বল্প উৎপাদনের জন্য এ দেশে মাথাপিছু আয় খুব কম। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ৪৪,৯৭০ ডলার, জাপান ৩৮,৪১০ ডলার, জার্মানি ৩৬,৬২০ ডলার, গণচীন ২0১0 ডলার, সেখানে বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় মাত্র *৫২০ ডলার। ধীরে হলেও আমাদের মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ করা যায়।

৪. জীবনযাত্রার নিম্নমান : স্বল্প আয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবনযাপন করে। তারা জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম উপকরণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে এ দেশের *১৪.০৬ কোটি লোকের অর্ধেকের বেশি খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতায় ভুগে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলছে।

৫. মূলধনের স্বল্পতা : বাংলাদেশে স্বল্প আয়ের জন্য সঞ্চয় কম। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে আমাদের কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন অনেক কম। স্বল্প উৎপাদনই আমাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ।

৬. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.০৩%।[৯] বর্তমানে এই হার হ্রাস পেয়ে *১.৪১% হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বেশি। এ দেশের বিপুল জনসংখ্যা, খাদ্য ঘাটতি ও বেকারত্বসহ অন্যান্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাই জনসংখ্যা সমস্যাকে আমাদের এক নম্বর জাতীয় সমস্যারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৭. বেকার সমস্যা : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের অভাবে বর্তমানে বাংলাদেশে তীব্র বেকার সমস্যা বিদ্যমান। দেশের মোট কর্মক্ষম জনশক্তির প্রায় *২.২ মিলিয়ন বেকার। এ ছাড়া কৃষিতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লোক নিয়োজিত থাকায় 'ছদ্ম বেকারত্ব' সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মাথাপিছু কৃষি উৎপাদন কম হচ্ছে।

৮. খাদ্য ঘাটতি : কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ খাদ্য ঘাটতি বিদ্যমান। অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশকের অভাব, পর্যাপ্ত সেচ সুবিধার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। ফলে খাদ্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম।

৯. শিক্ষার অভাব : শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নির্ধারক। বাংলাদেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার শতকরা **৬৫% । ব্যাপক শিক্ষাহীনতার জন্য দেশের সামাজিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল নয়। বাংলাদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দক্ষ শ্রমিক ও সংগঠক শ্রেণী গড়ে উঠেনি। এর ফলে শিল্প কারখানায় উৎপাদন কম এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মানও নিচু হয়ে থাকে।

১০. বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি : বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন কম হওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ কম। কিন্তু আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বহুমুখী চাহিদা পূরণ এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশি। ফলে এ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবছর রপ্তানি আয় অপেক্ষা আমদানি ব্যয় বেশি হয়ে থাকে।

১১. বিদেশি সাহায্যের ওপর অতিনির্ভরতা : বাংলাদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম হওয়ায় তাদের সঞ্চয় খুব কম। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে পর্যাপ্ত অর্থ দরকার তা দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা যায় না। এ জন্য আমাদেরকে অতিমাত্রায় বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। বিদেশি সাহায্য কমে গেলে বা আসতে দেরি হলে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

১২. অনুন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন, সড়ক, রেল ও নৌপথ, সেচ ব্যবস্থা, নদী ও সমুদ্র বন্দর, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নত নয়।

---

* বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক-২০০৭. ৯ উৎস : বাংলাদেশ আদমশুমারী-১৯৯১।

** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৩

এখানে সামাজিক অবকাঠামো যেমন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ও উন্নত নয়। অনুন্নত অবকাঠামোর জন্য এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয়।

১৩. সম্পদের অসম বণ্টন : বাংলাদেশের বেশিরভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত। এ জন্য অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

১৪. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নও করা যায় না। এর ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধিত হয় না।

১৫. অনুন্নত সামাজিক পরিবেশ : অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ফতোয়াবাজি ইত্যাদি কারণে সামাজিক পরিবেশ উন্নত নয়। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসেবামূলক কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হয়।

১৬. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক স্থিরতা ও শান্তি-শৃংখলা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্দোলন ও অশান্তির জন্য কলকারখানায় উৎপাদন হ্রাস পায় এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

১.৫.২ অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান/অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায়

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার :

১. কৃষি উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। তাই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপায় হল কৃষি উন্নয়ন। কৃষির উন্নয়ন হলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। খাদ্য উৎপাদন বাড়লে খাদ্য ঘাটতিও থাকবে না। আধুনিক চাষ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ ও সারের ব্যবহার, পানি সেচের সুযোগ বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সমবায় খামার প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা কৃষির উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

২. দ্রুত শিল্পোন্নয়ন : বর্তমানে বিশ্বের কোনো দেশের পক্ষেই শিল্প উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কৃষির পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়ন করতে হবে। এতে আমাদের প্রচুর শ্রমশক্তি, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে।

৩. মূলধন বৃদ্ধি : দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ বাড়ালে উৎপাদন ও আয় বাড়বে। এ জন্য মূলধন বৃদ্ধির স্বার্থে জনগণের সঞ্চয় বাড়াতে হবে এবং লাভজনক বিনিয়োগের জন্য সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

৪. প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার : বাংলাদেশে উর্বর কৃষি জমি, পানি সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য আছে। আরো কয়েকটি খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হলে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়বে।

৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশে যে উচ্চ হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তা রোধ করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাহলে বেকারত্ব হ্রাস এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য ইতোমধ্যে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনগণের আগ্রহ বেড়েছে।

৬. শিক্ষার প্রসার : অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে আমাদের জনগণের নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। এর ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়বে এবং জনগণের উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হবে। সাম্প্রতিককালে দেশে শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি ব্যয় অনেক বেড়েছে।

৭. কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি : কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ জন্য দেশে বেশি সংখ্যক কারিগরি স্কুল, কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

৮. বেকার সমস্যার সমাধান : জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য বেকারত্ব দূর করতে হবে। এ জন্য আমাদের দেশে মূলধনভিত্তিক শিল্পের পরিবর্তে শ্রমভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ও পেশা গড়ে তুলতে হবে।

৯. অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন : কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য উন্নত অর্থনৈতিক অবকাঠামো অপরিহার্য। আমাদের দেশে রাস্তাঘাট, রেল ও জলপথ, টেলিযোগাযোগ, পানি সেচ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্দর, বাঁধ ইত্যাদি মৌলিক অবকাঠামোর দ্রুত উন্নতি করতে হবে।

১০. বৈদেশিক সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবহার : বাংলাদেশ প্রতিবছর বিশ্বব্যাংক, অন্যান্য সংস্থা ও বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি ঋণ ও সাহায্য লাভ করে। এসব বিদেশি সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহার করা হলে আমাদের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাবে।

১১. সুষ্ঠু পরিকল্পনা : অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং দ্রুত উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবশ্যক। তাছাড়া আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা দরকার।

১২. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি : বাংলাদেশের অসংখ্য সহায় সম্বলহীন দরিদ্র নারী-পুরুষকে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ ও সাহায্য দেওয়া উচিত। এ সাহায্যের মাধ্যমে তারা হাঁস-মুরগির খামার, পশু পালন, মাছ চাষ, ফুল, ফলের চাষ, হাতের কাজ, ছোট দোকান প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারবে।

১৩. জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন : বর্তমানে বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ফলে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ও দারিদ্র্য বাড়ছে। এটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিপন্থী। উন্নয়নের উপযুক্ত নীতির মাধ্যমে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন : শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, সামাজিক আন্দোলন ও যথাযথ আইন প্রণয়ন করে আমাদের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, প্রতিকূল সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি দূর হলে উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

১৫. সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা : অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও দক্ষ হতে হবে। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন।

এক কথায়, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের উত্তম পথ হচ্ছে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম চালানো উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ?

ক. অফিস আদালতে চাকরি করা খ. শখ করে বাগান করা
গ. ভিক্ষার মাধ্যমে আয় করা ঘ. মায়ের সন্তান লালন পালন করা

২। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় অদৃশ্য শক্তি হিসাবে দাম ব্যবস্থার প্রধান ভূমিকা কী হতে পারে?

ক. দামের সমতা রক্ষা করে অর্থনীতি পরিচালনা
খ. অর্থনৈতিক কার্মকাণ্ড সুশৃঙ্খল ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত করা
গ. বাজার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা
ঘ. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা

৩। একটি সংক্ষিপ্ত সময়ে যেহেতু মানুষের দ্রব্য এবং সেবার অভাব অফুরন্ত কিন্তু সম্পদ সীমিত, অতএব মানুষ অবশ্যই-

ক. সম্পদ বৃদ্ধি করবে খ. অভাব কমাবে
গ. বিকল্প দ্রব্য ও সেবা বেছে নেবে ঘ. দ্রব্য ও সেবার ভোগ কমাবে

৪। একটি সংক্ষিপ্ত সময়ে মানুষের দ্রব্য এবং সেবার অভাব অফুরন্ত কিন্তু সম্পদ সীমিত। এরূপ অবস্থায় পড়লে তুমি কি করতে?

ক. সম্পদের বৃদ্ধি সাধন খ. অভাব কমানো
গ. বিকল্প দ্রব্য এবং সেবা বেছে নেয়া ঘ. দ্রব্য এবং সেবার ভোগ কমানো

৫। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকল উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল-

ক. জনগণের কল্যাণ সাধন করা খ. মুনাফা সর্বোচ্চ করা
গ. বিক্রয় মূল্য সর্বোচ্চ করা ঘ. আয়ের সুষম বন্টন

৬। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কিছু উক্তি নিচে দেয়া হল :

i. উন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো সবল হওয়ার কারণেই তারা উন্নত
ii. দক্ষ জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত
iii. পর্যাপ্ত মূলধন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii এবং iii

৭। উন্নয়নশীল দেশের প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রবণতা
ii. কৃষি ও শিল্পের ক্রম উন্নয়ন
iii. উন্নত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও ।

জনাব রহিম একজন সচেতন নাগরিক। তিনি গবেষণা করে দেখেছেন তাঁর দেশে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ তাঁর দেশে উৎপাদন কম, যার ফলে আয়ও কম। আয় কম হওয়াতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগও কম, আর বিনিয়োগের স্বল্পতা, উৎপাদন স্বল্পতার জন্য দায়ি। এভাবে সমস্যাগুলো পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আবর্তিত হয়।

৮। জনাব রহিমের দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে কী নামে অভিহিত করা হয় ?

ক. উৎপাদনের দুষ্টচক্র খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র
গ. বিনিয়োগের দুষ্টচক্র ঘ. মূলধনের দুষ্টচক্র

৯। উক্ত দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি ?

i. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ii. খাদ্য সমস্যা বৃদ্ধি

iii. শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

১০। বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৪.৭% এবং ২০০৪ সালে সূচকটি ছিল ৪২.১%। এই সূচক অনুসারে উক্ত সময়সীমায় গড়ে প্রতিবছর দারিদ্র্য হ্রাসের হার হল-

ক. ০.৪৩% খ. ০.৫২%

গ. ১.৩০% ঘ. ২.৬০%

১১। নিম্নোক্ত কোন কারণগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ি ?

i. আমদানির পরিমাণ বেশি

ii. কৃষি ব্যবস্থার অদক্ষতা

iii. মূলধন গঠনের নিম্নহার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মালয়েশিয়া বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি আলোচিত দেশ, যাকে এশিয়ান টাইগার বা এশিয়ার বাঘ নামেও অভিহিত করা হয়। ত্রিশ বছর আগেও দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের মতোই ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, কঠোর ও নিবেদিত পরিশ্রম, সঠিক পরিকল্পনা এবং তার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশটি কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে সরকার যথেষ্ট সক্রিয়। তাছাড়া ভারি ও মাঝারি শিল্পেও মালয়েশিয়াতে প্রচুর দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা ও স্তরের ভিত্তিতে মালয়েশিয়াকে কি ধরনের দেশ বলা যায়?

খ. মালয়েশিয়ার মতো দেশের অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

গ. মালয়েশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মালয়েশিয়ার কোন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব ? বিশ্লেষণ কর।

২। রহিম একজন দরিদ্র বাংলাদেশি ভূমিহীন কৃষকের সন্তান। তার পিতা-মাতা পরিবারের দারিদ্র্যচক্র ভাঙ্গাতে পদক্ষেপ নিলেন। এ জন্যে রহিমকে এস, এস,সি,র পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে ক্লাস করে যেতে তাঁরা উৎসাহিত করলেন। রহিম স্কুলের পাঠ চুকানোর পর একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা আরম্ভ করল। এই ব্যবসায় থেকে সে প্রতি সপ্তাহে যা উপার্জন করতো তার কিছু অংশ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিল। পরে সে তার সঞ্চয়ের কিছু অংশ পিতা ও মাতাকে দিল।

ক. দারিদ্র্য কী ?

খ. কম বিনিয়োগ কীভাবে কম উৎপাদন ঘটায়, তা ব্যাখ্যা কর।

গ. রহিমের পরিবার কীভাবে দারিদ্র্যচক্র ভাঙ্গাতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ''তরুণ জনগোষ্ঠীকে অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত করা হল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোত্তম পন্থা'' উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৩। 'ক' ও 'খ' দুটি দেশ । 'ক' দেশে উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগসহ সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় করে, 'খ' দেশে 'ক' দেশের বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় । এখানে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন । এ দেশে ভোক্তা তার ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করে যে কোনো দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভোগ করতে পারে না।

ক. 'ক' দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে ?

খ. 'ক' দেশের অর্থ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

গ. 'খ' দেশের অর্থ ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থার তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় কর।

ঘ. তুমি কি ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থন করবে ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা

SOME BASIC CONCEPTS OF ECONOMICS

২.১.১ অভাবের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে অভাব বলতে আর্থিক অনটন বা অসচ্ছলতাকেই বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে বস্তুগত বা অবস্তুগত যে কোনো সামগ্রী লাভের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে। বস্তুত জীবন ধারণ অথবা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কিংবা বিলাসব্যসনের উদ্দেশ্যে মানুষের মনে দ্রব্য ও সেবার জন্য ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। এ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাই হল অভাব। অভাব পূরণের জন্যই মানুষ অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। মানুষের সকল কর্ম প্রেরণার উৎস হল অভাব।

২.১.২ অভাবের বৈশিষ্ট্য

মানুষের জীবনে যেসব অভাব দেখা দেয় তার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১. অভাব অসীম : মানুষের অভাবের কোনো শেষ নেই। একটি অভাব পূরণ হওয়ার সাথে সাথে আরো অনেক অভাব দেখা দেয়। তাই কোনো মানুষই তার জীবনের সব অভাব পূরণ করতে পারে না।

২. বিশেষ অভাব সসীম : অভাব অসীম হলেও মানুষের কোনো একটি বিশেষ অভাবের সীমা আছে। কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকলে তার উপযোগ হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত ঐ দ্রব্যের জন্য আর অভাববোধ থাকে না।

৩. অভাব পরস্পরের পরিপূরক : মানুষ একই সাথে অনেক দ্রব্যের অভাব অনুভব করে। যেমন, গাড়ির অভাব পূরণের জন্য পেট্রোলের প্রয়োজন হয়। তাই অনেকসময় একটি দ্রব্যের অভাব পূরণ করতে গেলে একই সাথে অন্যটির অভাবও পূরণ করতে হয়।

৪. অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী : অভাব পূরণের উপায়গুলো সীমিত বলে মানুষ একই সময়ে তার সব অভাব পূরণ করতে পারে না। যেসব অভাব কম গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো বাদ দিয়ে মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলো প্রথমে পূরণ করে। সে অর্থে অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে থাকে।

৫. সব অভাবের তীব্রতা একরকম নয় : সব অভাবের তীব্রতা মানুষ একইরকম অনুভব করে না। কোনো অভাববোধ করার সাথে সাথে তা পূরণ করতে হয়, কোনো অভাব বিলম্বে পূরণ করলেও চলে, আবার কিছু অভাব একেবারে স্থগিত রাখা যায়।

৬. অভাব পূরণের বিকল্প উপায় : বেশিরভাগ অভাবই বিকল্প উপায়ে পূরণ করা যায়। যেমন, পিপাসা লাগলে পানি, শরবত অথবা ঠান্ডা পানীয় পান করে তা মেটানো যায়।

৭. অনুকরণভিত্তিক অভাব : অনুকরণপ্রিয়তা থেকে অনেক অভাবের সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশীর ঘরে ফ্রিজ, রঙিন টেলিভিশন দেখে কেউ সেগুলোর অভাব অনুভব করতে পারে।

২.১.৩ অভাবের শ্রেণীবিভাগ

মানুষ যেসব অভাব বোধ করে, সেগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, ১. প্রয়োজনীয় অভাব, ২. আরামপ্রদ অভাব এবং ৩. বিলাসজনিত অভাব।

১. প্রয়োজনীয় অভাব : যে অভাবগুলো পূরণ না হলে জীবন ধারণ অসম্ভব, তাকে প্রয়োজনীয় অভাব বলে। যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির অভাব। গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অভাবগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন, (ক) জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় ও (গ) অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় অভাব।

ক. জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব : যেসব দ্রব্য মানুষের জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেগুলোর অভাবকে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব বলে। যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর অভাবই হল জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব।

খ. দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় অভাব : যেসব দ্রব্য মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ায়, সেসব দ্রব্যের অভাবকে দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় অভাব বলে। যেমন, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বলে ঐগুলোর অভাব হল দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় অভাব।

গ. অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় অভাব : জীবন ধারণ কিংবা কর্মদক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় না হলেও বারবার ব্যবহারের ফলে যেসব দ্রব্য ব্যবহারকারীর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়, সেসব দ্রব্যের অভাবকে অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় অভাব বলে। চা, সিগারেট, পান ইত্যাদি দ্রব্যের অভাব অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় অভাব।

২. আরামপ্রদ দ্রব্যের অভাব : আরামদায়ক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের জন্য যেসব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় সেগুলোর অভাবকে আরামপ্রদ দ্রব্যের অভাব বলে। যেমন, উন্নতমানের খাদ্যদ্রব্য, রুচিসম্মত পোশাক ইত্যাদি।

৩. বিলাসজনিত অভাব : অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয় অথচ জাঁকজমক অথবা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যেসব দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, সেসব দ্রব্যের অভাবকে বিলাসজনিত দ্রব্যের অভাব বলে। যেমন, মূল্যবান অলঙ্কার, দামি গাড়ি ইত্যাদি। দরিদ্র দেশে এসব দ্রব্যের ভোগ সমাজের সীমিত সম্পদের অপচয় ঘটায়।

স্থান কাল পাত্রভেদে অভাবের এ শ্রেণীবিভাগের পার্থক্য ঘটে। যেমন, কোনো উন্নত দেশে এক জন সাধারণ লোকের কাছে মোটর গাড়ির অভাব প্রয়োজনীয়, বাংলাদেশে এক জন ডাক্তারের কাছে তা আরামপ্রদ এবং কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে তা বিলাসজনিত অভাব। কাজেই বলা যায়, অভাবের শ্রেণীবিভাগ চূড়ান্ত নয়, বরং আপেক্ষিক।

২.২.১ সম্পদ

যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ এবং বিক্রয়যোগ্য সেসব দ্রব্যসামগ্রীকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলে। দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়যোগ্য হতে হলে তা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে এবং তার বাহ্যিকতা থাকতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, বাড়িঘর ইত্যাদি সম্পদ।

উল্লেখ্য, অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী, যেমন, ব্যবসায়ের সুনাম, নার্সের সেবা ইত্যাদিও অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। সম্পদ দ্বারা মানুষের অভাব পূরণ হয়। তাই সম্পদ সৃষ্টি করা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

২.২.২ সম্পদের বৈশিষ্ট্য

অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। যেমন, ১.উপযোগ, ২. অপ্রাচুর্যতা, ৩. হস্তান্তরযোগ্যতা ও ৪. বাহ্যিকতা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১. উপযোগ : উপযোগ সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। কোনো দ্রব্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে হলে অবশ্যই তার উপযোগ থাকতে হবে। উপযোগহীন দ্রব্য অর্থের বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয় যোগ্য নয় এবং সে জন্য তা সম্পদ নয়।

২. অপ্রাচুর্যতা : কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার যোগান চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত হতে হবে। নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান অপ্রচুর নয় বলে সেগুলো সম্পদ নয়। কিন্তু ধান, পাট, পোশাক প্রভৃতির যোগান অপ্রচুর বলে সেগুলো সম্পদ।

৩. হস্তান্তরযোগ্যতা : সম্পদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল হস্তান্তরযোগ্যতা। হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে দ্রব্যের মালিকানা পরিবর্তনের যোগ্যতাকে বোঝায়। ক্রয়বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো দ্রব্য হস্তান্তর করা না গেলে তা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় না। জমির মালিকানা পরিবর্তন করা যায় বলে তা সম্পদ।

৪. বাহ্যিকতা : এটি সম্পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। দ্রব্য বাহ্যিক হলে তা হস্তান্তরযোগ্য হয় এবং সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। আসবাবপত্র, কাপড় প্রভৃতি বাহ্যিক দ্রব্য এবং হস্তান্তরযোগ্য বলে সম্পদ। অন্যদিকে মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ, যেমন, প্রতিভা, দক্ষতা ইত্যাদি হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে তা সম্পদ নয়।

তাই যেসব দ্রব্যের উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা –এ চারটি গুণ বিদ্যমান, অর্থনীতিতে সেগুলোকে সম্পদ বলে। কোনো দ্রব্যের মধ্যে এ চারটি বৈশিষ্ট্যের যে কোনো একটি না থাকলে তা সম্পদ বলে গণ্য হয় না।

২.২.৩ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

উৎপত্তি ও মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত উৎপত্তির ভিত্তিতে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, ১. প্রাকৃতিক সম্পদ, ২. মানবিক সম্পদ ও ৩. মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ ।

১. প্রাকৃতিক সম্পদ : প্রকৃতির যেসব দান মানুষের উপকার বা প্রয়োজনে লাগে সেগুলোই হল প্রাকৃতিক সম্পদ । এ অর্থে জমি, খনিজ সম্পদ, নদনদী, বনভূমি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ।

২. মানবিক সম্পদ : মানুষের মানবিক গুণাগুণকে মানবিক সম্পদ বলে। যেমন, শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা, সংগঠন ক্ষমতা ইত্যাদি। তবে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে সম্পদ বলা যায় না, কারণ এগুলোতে সম্পদের অন্যতম প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই।

৩. মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ : প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ বলে। যেমন, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি। মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদের মধ্যে যেগুলো অধিক উৎপাদনের কাজে লাগে তাকে মূলধন বা পুঁজি বলে।

দ্বিতীয়ত, মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, ১. ব্যক্তিগত সম্পদ, ২. সমষ্টিগত সম্পদ, ৩. জাতীয় সম্পদ এবং ৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ ।

ব্যক্তিগত সম্পদ : ব্যক্তির নিজ মালিকানাধীন সকল সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমন, নিজস্ব জমি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সমষ্টিগত সম্পদ : সরকার বা জনগণের মালিকানাধীন সম্পদকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। যেমন, রাস্তাঘাট, পার্ক, চিড়িয়াখানা, ডাকঘর, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, বাঁধ ইত্যাদি। এগুলোর ওপর সবার সমান অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকে।

জাতীয় সম্পদ : ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের সমষ্টিকে জাতীয় সম্পদ বলে। যেমন, জনগণের দক্ষতা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি সম্পদ প্রভৃতি। জাতীয় সম্পদ হিসেবের সময় দেশের ভেতরের বিদেশি মালিকানাধীন সম্পদ বিয়োগ এবং বিদেশে দেশি মালিকানাধীন সম্পদ যোগ করা হয়। সমগ্র জাতি এ সম্পদের মালিক।

আন্তর্জাতিক সম্পদ : যেসব সম্পদ কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির মালিকানাধীন নয়, বরং সব দেশই সেগুলো ভোগ করতে পারে তাকে আন্তর্জাতিক সম্পদ বলে। পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নদী, জাতিসংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পদ।

২.২.৪ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতি প্রদত্ত যেসব সম্পদ দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং মানুষের উপকারে লাগে সেগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে এ দেশের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, নদনদী ও সমুদ্র অঞ্চল, কৃষিক্ষেত্র, খনিজ, বনজ, প্রাণীজ ও শক্তি সম্পদ প্রভৃতিকে বোঝায়। বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এসব সম্পদের মূল্যবান অবদান রয়েছে। নিচে এ দেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দেওয়া হলঃ

ক. কৃষি সম্পদ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে পলি সমৃদ্ধ উর্বর কৃষিক্ষেত্র। আমাদের জমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদনদী প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। এ দেশে প্রায় ২ কোটি ২২ লক্ষ একর চাষযোগ্য কৃষি জমি রয়েছে। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ২১ ভাগ কৃষি থেকে আসে।

খ. খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। এখানে এ পর্যন্ত যেসব খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। এ পর্যন্ত দেশে ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে গ্যাসের মোট মজুদ প্রায় ১৩২২৩.১৪৯ বিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে কেবল ১৭টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্রগুলো হল : বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশিদপুর, সিলেট, তিতাস, বেলাবো (নরসিংদী), মেঘনা, সাঙ্গু, সালদা নদী, জালালাবাদ, বিয়ানিবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ফেনী, বিবিয়ানা ও বাঙ্গুরা। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানা ও গৃহে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. চুনাপাথর : সিমেন্ট, কাঁচ, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেটের ভাঙ্গারহাট ও বাগলীবাজার, সুনামগঞ্জের টেকেরহাট, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ এবং চট্টগ্রামের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চুনাপাথরের মজুত রয়েছে।

৩. চীনামাটি : ময়মনসিংহের বিজয়পুর ও নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় চীনামাটির মজুদ রয়েছে। এটি বাসনপত্র, সেনিটারি দ্রব্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. কয়লা : বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তবে এসব স্থান থেকে কয়লা উত্তোলন সম্ভব হয়নি। সন্ধানপ্রাপ্ত কয়লার মান উন্নত নয়।

৫. কঠিন শিলা : দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুর জেলার রাণীপুকুরে কঠিন শিলার মজুদ রয়েছে। রাস্তা, রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এ শিলা দরকার হয়।

৬. সিলিকা বালু : সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও জামালপুরে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। এটি কাঁচ, রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৭. গন্ধক : বারুদ তৈরি, দেয়াশলাই কারখানা, তেল পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গন্ধক লাগে। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৮. খনিজ তেল : সিলেটের হরিপুরে সম্প্রতি খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দেশের উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে।

৯. তামা : রংপুর জেলার রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার স্তরে সামান্য তামার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার, মুদ্রা প্রভৃতি তৈরির জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

গ. বনজ সম্পদ

বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য দেশের ভূখণ্ডের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমি মোট ভূখণ্ডের প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। যেমন, আমেরিকায় শতকরা ৩৪ ভাগ, জাপানে শতকরা ৬৩ ভাগ, বার্মায় শতকরা ৬৭ ভাগ এবং ভারতে শতকরা ২২ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সুন্দরবন : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৬,০১৭ বর্গ কিমি । এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মে। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এবং বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান পশু-পাখি বাস করে।

২. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি : এ দুটি জেলার প্রায় ১৫,৩৩৩ বর্গ কিমি পাহাড়িয়া এলাকা জুড়ে এ বন বিস্তৃত। এ বনে সেগুন, গর্জন, গামারি, জারুল, শিমুল, চম্পা, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

৩. মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমি : ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় মিলে এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১০৬৪ বর্গ কিমি । এখানে শাল, গজারি, বনজাম কড়ই প্রভৃতি গাছ জন্মে।

৪. সিলেটের বনভূমি : এ বনভূমি সিলেট জেলায় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১,০৪০ বর্গ কিমি । এখানে শিমুল, বনজাম, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বহু রকমের গাছ জন্মে।

৫. দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি : এ বন দেশের উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গ কিমি । এখানে শাল, গজারি প্রভৃতি গাছ জন্মে।

ঘ. প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদনদী, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। তবে প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ অপ্রতুল।

ঙ. শক্তি সম্পদ

কলকারখানা, যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। কয়েকটি উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। এগুলো হল কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌর শক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি সামগ্রী।

বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও তা এখনো উত্তোলন করা শুরু হয়নি। সিলেটের হরিপুরে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোলিয়াম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আণবিক ও সৌর শক্তির উৎপাদন এখনো এ দেশে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে শক্তির যোগান বহুলাংশে প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও প্রচলিত উপকরণ থেকে আসে। আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কলকারখানা, গৃহকর্ম ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করি। এ দেশে পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। একে পানি বিদ্যুৎ বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত। গ্যাস, তেল ও কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে তাপ বিদ্যুৎ বলে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

১. গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা

২. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া

৩. ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৪. সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নীলফামারী

নিম্নলিখিতগুলো এ দেশের গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

১. সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ

২. আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী

৪. শাহজিবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট

৫. চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এ দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি যেমন, কাঠ, খড়, গোবর, পাটখড়ি, তুষ, পাতা ইত্যাদি থেকেও তাপ শক্তি সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ করা দরকার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বায়ু প্রবাহ, সৌর তাপ ও জৈব গ্যাসকে শক্তি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আণবিক শক্তির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও এসব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

চ. পানি সম্পদ

পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি, যথা: ১. নদনদী, খাল বিল, পুকুর ও সমুদ্র, ২. বৃষ্টিপাত এবং ৩. ভূ-নিম্নস্থ পানি।

এ তিনটি উৎসের পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির যোগান কম বা বেশি হলে কৃষি কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র এলাকায় রয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ। নদী স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। আমাদের অসংখ্য নদনদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্য। নদনদীর পানি ও বৃষ্টিপাত দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে তা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

২.২.৫ উৎপাদন কার্যে সম্পদের ভূমিকা

দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পদের প্রয়োজন হয়। সম্পদ বিভিন্ন রকম, যেমন, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের সৃষ্ট সম্পদ এবং মানবিক সম্পদ। দেশের খেত-খামার, কল-কারখানা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিরাম ধারায় উৎপাদন কাজ চলে। এসব উৎপাদন কাজে এক বা একাধিক সম্পদ উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, নদনদী, ভূমির উর্বরতা, বনভূমি, পশুপাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। বাংলাদেশের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, নদনদী, মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। আবার মনুষ্য সৃষ্ট সম্পদ যেমন, উত্তম বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ শক্তি প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৃষি উৎপাদনের জন্য কৃষকের উদ্যোগ ও দক্ষতাও অপরিহার্য। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানা রকম সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন।

শিল্প কারখানায় উৎপাদনে কয়লা, লোহা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো শিল্পে উন্নত। বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম, কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের অভাবে শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়। বনজ সম্পদের দ্বারা অনেক রকম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলা যায়। শক্তি

সম্পদ রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজন। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইত্যাদি জনশক্তির দক্ষতা বাড়ায়। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ বাড়ে। মানুষের সৃষ্ট অসংখ্য সম্পদ, যা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, যাতায়াত ব্যবস্থা, যানবাহন প্রভৃতি অনেক রকম সম্পদ কৃষি ও শিল্পসহ দেশের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের উর্বর মাটি, অনুকূল জলবায়ু, প্রাণিজ, বনজ ও পানি সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পদের মৌলিক ভূমিকা রয়েছে।

২.৩.১ উপযোগ

সাধারণ কথায় উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের উপকারিতাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। যেমন, খাদ্য ক্ষুধা মেটায়, বস্ত্র লজ্জা ঢাকে, বাসস্থান আশ্রয় দেয় এবং সেবায় আরোগ্য লাভ হয় বলে এগুলোর উপযোগ আছে। কাজেই বস্তুগত অথবা অবস্তুগত যে কোনো দ্রব্য যা মানুষের কোনো না কোনো অভাব পূরণ করে তার উপযোগ আছে বলা যায়। অর্থনীতিবিদ মেয়ার্স বলেন, "উপযোগ হল কোনো দ্রব্যের ঐ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।"[১]

উপযোগের ধারণাটি বিবেচনার সময় কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার :

১. উপযোগ একটি মানসিক অনুভূতি।
২. উপযোগ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায়।
৩. উপযোগের সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই কারণ কিছু ক্ষতিকর দ্রব্যেরও উপযোগ আছে।
৪. স্থান, কাল ও পাত্রভেদে একই দ্রব্যের উপযোগ কম বেশি হয়।
৫. ভোক্তার কাছে কোনো দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার উপযোগ হ্রাস পায় ইত্যাদি।

২.৩.২ মোট উপযোগ

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। যেমন, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এক জন ভোক্তা যদি পর পর ৩টি পাকা আম ভোগ করে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় আম থেকে যথাক্রমে ৫ টাকা, ৪ টাকা ও ৩ টাকার সমান উপযোগ পায়, সেক্ষেত্রে তার মোট উপযোগ হবে (৫ টাকা + ৪ টাকা + ৩ টাকা) = ১২ টাকার সমান। তাই বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকৃত কোনো দ্রব্যের মোট উপযোগ = দ্রব্যের ১ম এককের উপযোগ + ২য় এককের উপযোগ + ৩য় এককের উপযোগ + ... ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ সাধারণত ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়।

২.৩.৩ প্রান্তিক উপযোগ

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের দরুন মোট উপযোগ যতটুকু বাড়ে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক ভোগের জন্য যে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয় তাই প্রান্তিক উপযোগ। যেমন, ধরা যাক, এক জন ভোক্তা ২ একক পাকা আম ভোগ করে ৯ টাকার সমান উপযোগ পায়। অতিরিক্ত আর ১ একক অর্থাৎ ৩য় একক ভোগ করার ফলে মোট উপযোগ বেড়ে যদি ১২ টাকা হয় তবে, সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ৩ টাকার সমান। এখানে মোট উপযোগ ৯ টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত ১ একক আম ভোগের জন্য ৩ টাকা যুক্ত হয়ে মোট উপযোগ ১২ টাকা হয়েছে।

---
১. "Utility is the quality or capacity of a good which enables it to satisfy human wants." -Meyers

২.৩.৪ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য

কোনো ভোক্তার একটি উপযোগ সূচি পর্যালোচনার মাধ্যমে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। আলোচ্য সূচিতে দেখা যায়, দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি হল মোট উপযোগ, আর অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হল প্রান্তিক উপযোগ। মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে, কারণ প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ সর্বাধিক হয় এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কমে।

উপযোগ সূচি

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৫.০০	৫.০০
২য়	৯.০০	৪.০০
৩য়	১২.০০	৩.০০
৪র্থ	১২.০০	০.০০
৫ম	৯.০০	-৩.০০

সুতরাং মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য হল নিম্নরূপ :

১. মোট উপযোগ হল ভোগকৃত দ্রব্যের সবগুলো এককের উপযোগের সমষ্টি। আর প্রান্তিক উপযোগ অতিরিক্ত এক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ। তাই প্রান্তিক উপযোগ মোট উপযোগের একটি অংশ মাত্র।

২. দ্রব্যের ভোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে। তাই মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।

৩. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ সর্বাধিক হয়।

৪. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ হ্রাস পায়।

২.৩.৫ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

সাধারণভাবে মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ অভাব সসীম। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি অভাবের পরিতৃপ্তি সম্ভব। ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাস পায়। ভোগের একক বৃদ্ধির ফলে উপযোগ হ্রাসের এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। বিধিটি বর্ণনা প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেন, “কোনো দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির ফলে কোনো ব্যক্তি যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তা ঐ দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ হ্রাস পায়।”[২]

বিধিটির অনুমিতিসমূহ : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কতকগুলো অনুমিতির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

১. ভোক্তা স্বাভাবিক বিচারসম্পন্ন লোকের মতো আচরণ করে।

২. ভোগকৃত দ্রব্যের উপযোগ অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।

৩. দ্রব্যের দাম তার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

৪. ভোগকালীন সময়ে ভোক্তার আয়, রুচি, পছন্দ ইত্যাদির পরিবর্তন হয় না।

৫. দ্রব্যের এককগুলো যুক্তিসঙ্গত পরিমানের।

৬. ভোক্তা দ্রব্যের প্রতি একক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোগ করে।

---

২. "The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of anything diminishes with the increase of the stock that he already has."- A. Marshall

বিধিটির দৃষ্টান্ত : উপরের অনুমিতিগুলোর ভিত্তিতে একটি উদাহরণের সাহায্য বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল।

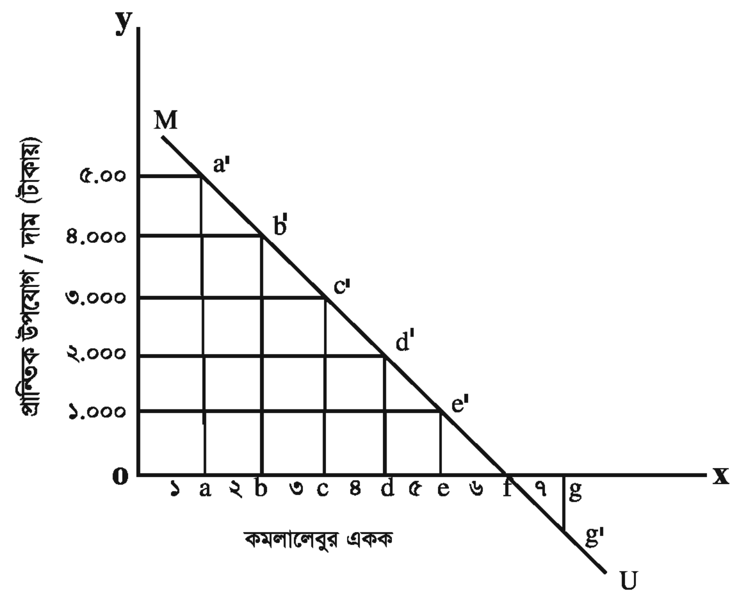
কমলালেবু (একক)	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৫.০০	৫.০০
২য়	৯.০০	৪.০০
৩য়	১২.০০	৩.০০
৪র্থ	১৪.০০	২.০০
৫ম	১৫.০০	১.০০
৬ষ্ঠ	১৫.০০	০.০০
৭ম	১৪.০০	-১.০০

উপযোগ সূচিতে দেখা যায় এক জন ভোক্তা ১ম কমলালেবু থেকে ৫.০০ টাকার সমান উপযোগ পায় এবং এ কারণে সে প্রথম কমলালেবুর জন্য ৫.০০ টাকা দাম দিতে চায়। এরপর ভোগ আরো বাড়লে সে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক যথাক্রমে ৪.০০ টাকা, ৩.০০ টাকা, ২.০০ টাকা ও ১.০০ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে। অর্থাৎ ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কমলালেবুর জন্য সে যথাক্রমে ৪.০০ টাকা, ৩.০০ টাকা, ২.০০ টাকা ও ১.০০ টাকা দাম দিতে রাজি থাকে। ৬ষ্ঠ একক কমলালেবু তার প্রয়োজন নেই বলে ৬ষ্ঠ এককের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য এবং এ পর্যায়ে ভোক্তার মোট উপযোগ সর্বাধিক হয়েছে। কাজেই ৭ম এককের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে- ১.০০ টাকা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যায়, ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং ভোক্তা প্রান্তিক এককগুলোর জন্য ক্রমান্বয়ে কম দাম দিতে রাজি থাকে। অতিরিক্ত এককের উপযোগ এভাবে হ্রাস পাওয়ার প্রবণতাই হল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি।

রেখাচিত্রের সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা :

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি রেখাচিত্রের সাহায্যেও বোঝানো যায়। চিত্রে OX ভূমি অক্ষে কমলালেবুর পরিমাণ এবং OY লম্ব অক্ষে তার প্রান্তিক উপযোগ ও দাম পরিমাপ করা হয়েছে।



চিত্রানুযায়ী ভোক্তা ১ম কমলালেবু থেকে aa' পরিমাণ উপযোগ তথা প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে এবং এ জন্য সে ৫.০০ টাকা দাম দিতে চায়। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম কমলালেবু থেকে ভোক্তা যথাক্রমে bb', cc', dd' এবং ee' পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। অর্থাৎ ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ভোক্তা ২য় কমলালেবুর জন্য ৩.০০ টাকা, ৪র্থ কমলালেবুর জন্য ২.০০ টাকা এবং ৫ম কমলালেবুর জন্য ১.০০ টাকা দাম দিতে রাজি থাকে। এখানে ৬ষ্ঠ এককের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য বলে ভূমি অক্ষ রেখার `f ' বিন্দু তা নির্দেশ করেছে। ৭ম এককের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ ১.০০ টাকা বিধায় gg' তা নির্দেশ করেছে। এখানে ee' <dd' <cc' <bb' <aa'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কমলালেবুর জন্য ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ভোক্তার কাছে তার অতিরিক্ত এককগুলোর উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। এখন a', b', c', d', e', f এবং g' বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখাটি পাওয়া যায়। ঐটিই ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ রেখা। রেখাটি নিম্নগামী। ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে। তাই প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি নিম্নগামী হয়েছে।

বিধিটির ব্যতিক্রম : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। নিচের কতকগুলো ক্ষেত্রে বিধিটির ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় :

১. ভোগকালীন সময়ে ভোক্তার অভ্যাস ও রুচি ভোগকৃত দ্রব্যের অনুকূলে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বাড়ে।

২. আকাঙ্ক্ষার তুলনায় দ্রব্যের একক যদি খুব ক্ষুদ্র বা অপরিমিত হয় তাহলে পরবর্তী এককের উপযোগ বাড়তে পারে।

৩. দ্রব্যের এককগুলো ভোগের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান বেশি হলে বিধিটি কার্যকর হয় না। তখন প্রথমটি ভোগের পরে দ্বিতীয়টির প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে পারে।

৪. শখ ও নেশার দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার ক্রমবর্ধমান আসক্তির দরুন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কমে না।

৫. টাকা পয়সা ও অন্যান্য প্রাচীন এবং দুর্লভ বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বাড়ে। সেক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না। ফলে প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বাড়ে।

৬. ভোগকালীন সময়ে ভোক্তার আয় বাড়লে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বাড়তে পারে।

৭. সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশায় মানুষ দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে বিধিটি কার্যকর হয় না। সেক্ষেত্রে বিলাস দ্রব্যের ক্রয় বাড়লে তার প্রান্তিক উপযোগ বাড়ে।

২.৩.৬ ভোগ

সাধারণ কথায়, ভোগ বলতে কোনো দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে তা নিঃশেষ করা বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোনো দ্রব্যকে একেবারে নিঃশেষ বা ধ্বংস করতে পারে না। ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে মাত্র। মানুষ তার অভাব পূরণের জন্য দ্রব্যের উপযোগ গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে তার উপযোগ গ্রহণ বা নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ভোগ করি। এর অর্থ হল আমরা ঐসব দ্রব্যের উপযোগ গ্রহণ করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যসামগ্রী ভোগের ফলে এগুলোর উপযোগ নিঃশেষ হয়। অতএব মানুষের অভাব পূরণের জন্য দ্রব্যের উপযোগ লাভ করাকে ভোগ বলে।

২.৪.১ চাহিদার সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে নিছক আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে না। ক্রেতার যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকে, অর্থনীতিতে তাকেই চাহিদা বলে। যেমন, কোনো লোকের মোটরগাড়ি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। কিন্তু তা ক্রয়ের জন্য তার অর্থ ও ইচ্ছা না থাকলে সে আকাঙ্ক্ষা চাহিদা হবে না। দ্রব্যটি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তবেই ঐ আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা হিসেবে গণ্য করা যায়। সুতরাং চাহিদার উপাদান তিনটি, যথা-

১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা

২. দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং

৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা।

উল্লেখ্য, চাহিদার সাথে সময় ও দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা বলতে বিশেষ সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণকে বোঝায়। অর্থনীতিবিদ বেনহাম বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্য যে পরিমাণ ক্রয় করা হয় তাই ঐ দ্রব্যের চাহিদা।"[৩]

২.৪.২ চাহিদা বিধি

কোনো দ্রব্যের চাহিদা তার দামের ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি

৩. "Demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price."- Benham

দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে, আবার দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। সুতরাং দাম ও চাহিদার মধ্যে একটি সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। দ্রব্যের দামের ওপর চাহিদার নির্ভরশীলতার এই সম্পর্ককেই চাহিদা বিধি বলে।

বিধিটির অনুমিতিসমূহ :

চাহিদা বিধির প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় যে, "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত" থাকবে। অর্থাৎ বিবেচ্য দ্রব্যের দাম ও চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব বিষয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। অন্যান্য অবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. ক্রেতার আয়
২. ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দ
৩. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম
৪. ক্রেতার সংখ্যা
৫. ক্রেতার স্বাভাবিক আচরণ।

যদি এসব বিষয় অপরিবর্তিত থাকে তবেই চাহিদা বিধি কার্যকর হবে।

চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম : চাহিদা বিধি কতকগুলো অনুমিত শর্তের ওপর নির্ভরশীল। এ শর্তগুলোর পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে না এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে না। নিচে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রমগুলোর বিবরণ দেওয়া হল :

১. ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন : ক্রেতার আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে ক্রীত দ্রব্যটির দাম বাড়া সত্ত্বেও তার চাহিদা কমবে না। আবার ক্রেতার আয় অনেকখানি কমে গেলে দ্রব্যের দাম কমলেও তার চাহিদা বাড়বে না।

২. অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন : অভ্যাস ও রুচি পরিবর্তনের ফলে যদি এক জন ভোক্তা চা-এর বদলে কফি পান করা আরম্ভ করে তবে চায়ের দাম কমলেও ঐ ব্যক্তির কাছে চা-এর চাহিদা বাড়বে না। অর্থাৎ চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটবে।

৩. বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তন : কোনো দ্রব্যের দাম স্থির থাকলেও তার চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে যদি বিকল্প বা পরিপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয়। যেমন, গুড়ের বিকল্প দ্রব্য চিনি। মনে করি চিনির দাম বাড়ল, সেক্ষেত্রে গুড়ের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও তার চাহিদা বাড়বে আবার কলম কালি পরিপূরক দ্রব্য। ধরা যাক, কলমের দাম কমার ফলে তার চাহিদা ও ব্যবহার বাড়ল। এখন কালির দাম বাড়লেও তার চাহিদা না কমে বরং বাড়বে। অর্থাৎ চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না।

৪. ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা : ভোক্তা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে একটি দ্রব্যের দাম আরো বাড়বে, তবে বর্তমানে ঐ দ্রব্যের দাম বাড়া সত্ত্বেও চাহিদা না কমে বরং বাড়বে। তেমনি ভবিষ্যতে একটি দ্রব্যের দাম আরো কমার সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানে তার দাম কমে থাকলেও চাহিদা বাড়বে না।

৫. জাঁকজমকপূর্ণ দ্রব্য : কিছু কিছু দ্রব্য আছে, যেমন, মনিমুক্তা, হীরক, নতুন ফ্যাশনের দামী জামা-কাপড়, দুষ্প্রাপ্য চিত্র প্রভৃতি, যেগুলো ধনী ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও আভিজাত্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি তার চাহিদা না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

৬. ভোক্তার অজ্ঞতা : কোনো কোনো ভোক্তা অজ্ঞতাবশত কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে একে মূল্যবান জিনিস বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে বেশি দামেও এ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। আর এ ধরনের ভোক্তা কোনো দ্রব্যের দাম কমলে একে নিকৃষ্ট দ্রব্য মনে করে ফলে দাম কমলে দ্রব্যটির চাহিদা কমে।

২.৪.৩ চাহিদা সূচি

দ্রব্যের চাহিদা তার দামের ওপর নির্ভরশীল। দামের পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। একটি নির্দিষ্ট

সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয় তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তকে চাহিদা সূচি বা চাহিদা তালিকা বলে। দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে সেটাই চাহিদা সূচি থেকে জানা যায়। চাহিদা সূচির একদিকে দ্রব্যের দাম এবং অন্যদিকে দ্রব্যের চাহিদা গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। চাহিদা সূচির একটি উদাহরণ দেওয়া হল :

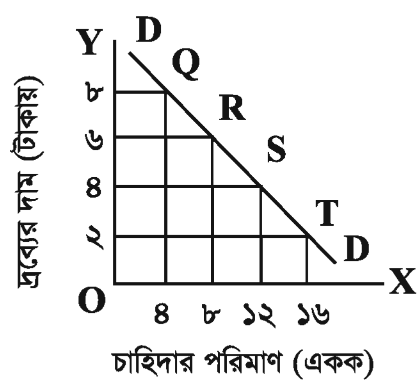
চাহিদা সূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৮.০০	৪
৬.০০	৮
৪.০০	১২
২.০০	১৬

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ৮ টাকা হলে এক জন ভোক্তা ৪ একক দ্রব্য ক্রয় করে । দাম কমে ৬ টাকা, ৪ টাকা ও ২ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে ৮ একক, ১২ একক ও ১৬ একক হয়। দাম ও চাহিদার মধ্যে বিদ্যমান বিপরীত সম্পর্ক চাহিদা সূচিতে প্রকাশ পায়।

২.৪.৪ চাহিদা রেখা

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তা যখন একটি রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, সে রেখাকে চাহিদা রেখা বলে। চাহিদা রেখার প্রতিটি বিন্দু একটি নির্দিষ্ট দামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা নির্দেশ করে। অর্থাৎ চাহিদা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হল চাহিদা রেখা। চাহিদা সূচির মতো চাহিদা রেখা থেকেও দ্রব্যের দাম ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক জানা যায়। নিচে একটি চাহিদা রেখার উদাহরণ দেওয়া হল।



রেখাচিত্রে OX ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও OY লম্ব অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে। DD হল চাহিদা রেখা। এ রেখার Q বিন্দুতে ৮ টাকা দামে দ্রব্যের চাহিদা ৪ একক। R, S ও T বিন্দুতে যথাক্রমে ৬ টাকা দামে চাহিদা ৮ একক, ৪ টাকা দামে চাহিদা ১২ একক ও ২ টাকা দামে চাহিদা হয় ১৬ একক। অর্থাৎ চাহিদা রেখার বিন্দুগুলো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করছে। দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকায় চাহিদা রেখা সাধারণত বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়।

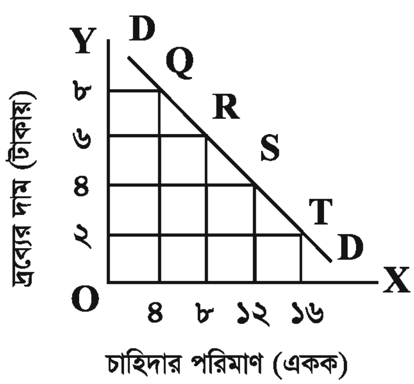
২.৪.৫ চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তা একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলে তাকে চাহিদা সূচি বা চাহিদা তালিকা বলে। চাহিদা সূচির এ তথ্য কথায় বা সংখ্যায় না লিখে একটি রেখার মাধ্যমে দেখানো হলে তাকে চাহিদা রেখা বলে। সুতরাং চাহিদা সূচির ভিত্তিতেই চাহিদা রেখা অংকন করা হয়। চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকনের জন্য নিচে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি নেওয়া হল।

চাহিদা সূচি

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৮.০০	৪
৬.০০	৮
৪.০০	১২
২.০০	১৬

উপরের চাহিদা সূচিতে দেখা যায়, এক জন ভোক্তা ৮ টাকা, ৬ টাকা, ৪ টাকা ও ২ টাকা দামে যথাক্রমে ৪, ৮, ১২ ও ১৬ একক দ্রব্য ক্রয় করে। এখন এ চাহিদা সূচির ভিত্তিতে একটি চাহিদা রেখা আঁকা হল।



রেখাচিত্রে OX ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং OY লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হল ৪ একক। এখন OY অক্ষের ৮ সূচক বিন্দু এবং OX অক্ষের ৪ সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব আঁকা হলে এরা পরস্পর Q বিন্দুতে মিলিত হয়। Q বিন্দুটি চাহিদা রেখার একটি বিন্দু হবে। দাম কমে ৬ টাকা হওয়ায় চাহিদা বেড়ে ৮ একক হয়েছে। লম্ব অক্ষে ৬ সূচক বিন্দু এবং ভূমি অক্ষের ৮ সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব আঁকা হলে এরা পরস্পর R বিন্দুতে ছেদ করে। R বিন্দুটি চাহিদা রেখার অপর একটি বিন্দু হল।

আগের মতোই লম্ব অক্ষের ৪ ও ২ সূচক বিন্দুগুলো থেকে এবং ভূমি অক্ষের ১২ ও ১৬ সূচক বিন্দুগুলো থেকে লম্ব আঁকা হলে সেগুলো যথাক্রমে S ও T বিন্দুতে মিলিত হয়। এ বিন্দুগুলোও চাহিদা রেখার অন্যান্য বিন্দু। এখন দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক Q, R, S ও T বিন্দুগুলো যোগ করলে DD রেখাটি পাওয়া যায়। এটিই চাহিদা রেখা। এ রেখাটি সাধারণত বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়ে থাকে।

২.৪.৬ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদা বিধি অনুযায়ী, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার হ্রাস ও বৃদ্ধি সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান হয় না। যেমন, অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের বেশি পরিবর্তন হলেও এর চাহিদার অল্প পরিবর্তন হয়। আবার বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম সামান্য কম বেশি হলে চাহিদা বেশি মাত্রায় বাড়ে বা কমে। এভাবে দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে অল্প বা বেশি হারে পরিবর্তিত হয়, সে হারকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা বলে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে মনথর বা দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়, তাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।"[৪]

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সূত্রাকারে নিম্নরূপ প্রকাশ করা যায় :

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}।$$

৪. The degree of rapidity or slowness with which demand changes with every change in price is known as Elasticity of demand.- Prof. A. Marsall

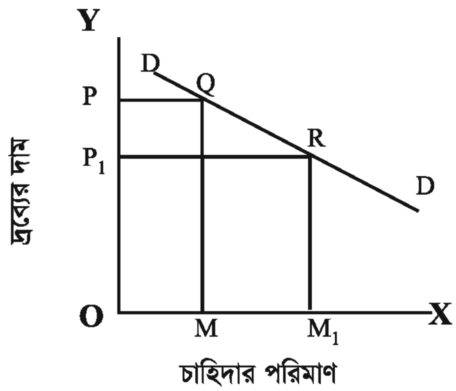
২.৪.৭ স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

১. স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় চাহিদা ও ২. অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় চাহিদা।

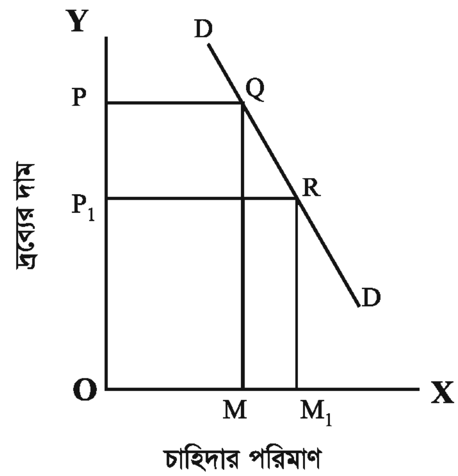
১. স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় চাহিদা : দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার বেশি হলে সে চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় চাহিদা বলে। সাধারণত বিলাস দ্রব্য যেমন, টেলিভিশন, ফ্রিজ, দামি মোটর গাড়ি, সৌখিন দ্রব্যাদি ইত্যাদির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। এসব দ্রব্যের দাম অল্প কমলে চাহিদা অনেক বেশি হয় এবং দাম অল্প বাড়লে চাহিদা অনেক কমে যায়।

উদাহরণস্বরূপ কোনো দ্রব্যের দাম যখন ২০.০০ টাকা তখন এর চাহিদা ১০০ একক হয়। দাম কমে ১৫.০০ টাকা হলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে হয় ১৫০ একক। এ ক্ষেত্রে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন বা দাম পরিবর্তনের হার ২৫% এবং চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন বা চাহিদা পরিবর্তনের হার ৫০%। দাম পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার বেশি হওয়ায় এ দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে স্থিতিস্থাপক চাহিদা ব্যাখ্যা করা হল :



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম OP থেকে হ্রাস পেয়ে OP_1 হওয়ায় দ্রব্যের চাহিদা OM থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OM_1 হয়েছে। এখানে দাম পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তন বেশি। অর্থাৎ $MM_1 > PP_1$। সুতরাং এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদা।

২. অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় চাহিদা : দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার কম হলে সে চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় চাহিদা বলে। সাধারণত অত্যাবশ্যক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন লবণ, চাল, ডাল, দিয়াশলাই ইত্যাদির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এসব দ্রব্যের দাম বেশি বাড়লেও চাহিদা খুব একটা কমে না। আবার দাম কমে গেলেও চাহিদা বেশি বাড়ে না। উদাহরণস্বরূপ কোনো দ্রব্যের দাম ১০.০০ টাকা হলে তার চাহিদা ১০০ একক। দাম কমে ৬.০০ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে ১২০ একক হয়। এক্ষেত্রে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন বা পরিবর্তনের হার ৪০% এবং চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন বা চাহিদার পরিবর্তনের হার ২০%। দাম পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদা পরিবর্তনের হার কম হওয়ায় এ দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ব্যাখ্যা করা হল :



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে দ্রব্যের দাম OP থেকে হ্রাস পেয়ে OP_1 হওয়ায়, চাহিদা OM থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OM_1 হয়েছে। এখানে দাম পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তন কম। অর্থাৎ $MM_1 < PP_1$। সুতরাং এটি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।

২.৫.১ যোগান

সাধারণ কথায় বাজারে কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে যোগান বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে সে দ্রব্যের যোগান বলে। দাম ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। এ কারণে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট দাম ও সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়ে থাকে। অর্থনীতিবিদ মেয়ার্স বলেন, "আমরা যোগানকে এমন সূচি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যা নির্দিষ্ট সময়ে সম্ভাব্য দামে বিক্রয়ের জন্য কোনো দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করে।"[৫]

২.৫.২ যোগান ও মজুদের মধ্যে পার্থক্য

অর্থনীতিতে যোগান ও মজুদ দুটি পৃথক ধারণা। বিক্রয়যোগ্য একটি দ্রব্যের মোট পরিমাণ হল মজুদ। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা ঐ মজুদ থেকে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে ঐ দ্রব্যের যোগান বলে। যেমন, ধরা যাক, এক জন বিক্রেতার বিক্রয়যোগ্য মোট ৫০০ কেজি চাল আছে এবং বাজারে প্রতি কেজি চালের দাম ১৫ টাকা। যদি এ দামে বিক্রেতা ২০০ কেজি চাল বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে সেক্ষেত্রে ৫০০ কেজি চালকে মজুদ এবং ২০০ কেজি চালকে যোগান বলা হবে। সুতরাং মজুদ বলতে বিক্রয়যোগ্য একটি দ্রব্যের মোট পরিমাণকে বোঝায় যা দামের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু মজুদের যে অংশ যোগান হিসেবে গণ্য তা একটি নির্দিষ্ট দাম ও সময়ের প্রেক্ষিতে বিক্রয়ের জন্য তৈরি থাকে।

২.৫.৩ যোগান বিধি

কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার যোগানের সম্পর্ক দেখা যায়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্যের যোগান তার দামের ওপর নির্ভরশীল। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, দাম কমলে যোগান কমে। দাম ও যোগানের মধ্যে এ সম্পর্ককেই যোগান বিধি বলে। দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি না পেয়ে দাম বাড়লে বিক্রেতা বেশি মুনাফা আয় করতে পারবে। সুতরাং দ্রব্যের যোগান বাড়বে। দাম কমলে মুনাফার পরিমাণ কমবে। সুতরাং বিক্রেতা দ্রব্যটির যোগান কমাবে।

কাজেই যোগান বিধি থেকে জানা যায় যে, দ্রব্যের দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যের দাম ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকলে যোগান বিধিটি কার্যকর হয়। অন্যান্য বিষয় বলতে উপকরণের প্রাপ্তি, উপকরণের দাম, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রাকৃতিক অবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতিকে বোঝায়। এসব বিষয়ের পরিবর্তন হলে যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

যোগান বিধির ব্যতিক্রম : কয়েকটি ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয় না। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে না এবং দাম কমলে যোগান কমে না। যোগান বিধির ব্যতিক্রমগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১. সীমাবদ্ধ যোগান : কিছু কিছু দ্রব্য আছে যা পুনরায় উৎপাদন করা যায় না বলে তার যোগান স্থির। যেমন, মৃত শিল্পীর আঁকা ছবি, পূরাকীর্তি ইত্যাদি। এসব দ্রব্যের দাম যতই বাড়ুক, তার যোগান বাড়ে না।

২. ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা : ভবিষ্যতে আরো দাম বাড়বে এ রকম সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানের বেশি দামেও যোগান বাড়বে না আবার ভবিষ্যতে দাম কমার সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানে কম দামেও দ্রব্যের যোগান বাড়বে।

৩. শ্রমিকের যোগান : শ্রমিকের মজুরি বাড়লে অনেক সময় শ্রমিকরা শ্রমের বদলে বিশ্রাম ভোগ করতে চায়। ফলে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে না।

৪. উৎপাদন খরচ : কোনো দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বাড়লে মুনাফা হ্রাস পায়। সেক্ষেত্রে উৎপাদনকারী উৎপাদন হ্রাস করে। ফলে দ্রব্যটির দাম বাড়লেও যোগান বাড়ে না।

---

৫. "We may define supply as a schedule of the amount of a good that would be offered for sale at all possible prices at any one instant of time."- Meyers

৫. প্রাকৃতিক অবস্থা : বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে কৃষি পণ্যের উৎপাদন কমে যায়। সেক্ষেত্রে এসব দ্রব্যের দাম বাড়লেও যোগান বাড়ানো যায় না।

৬. পরিবহন সমস্যা : যাতায়াত ও পরিবহনের অসুবিধা দেখা দিলে কোনো কোনো এলাকায় দ্রব্যের দাম বাড়লেও তার যোগান স্বল্পকালে বাড়ানো যায় না। এসব ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

২.৫.৪ যোগান সূচি

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিক্রেতা দ্রব্যটির যে বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দেয় তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে যোগান সূচি বা যোগান তালিকা বলে। দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, দাম কমলে যোগান কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের এ সমমুখী পরিবর্তনকে গাণিতিকভাবে যোগান সূচিতে দেখানো হয়। যোগান সূচির একদিকে দ্রব্যের দাম এবং অন্যদিকে দ্রব্যের যোগান গাণিতিকভাবে লেখা হয়। নিচে যোগান সূচির একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

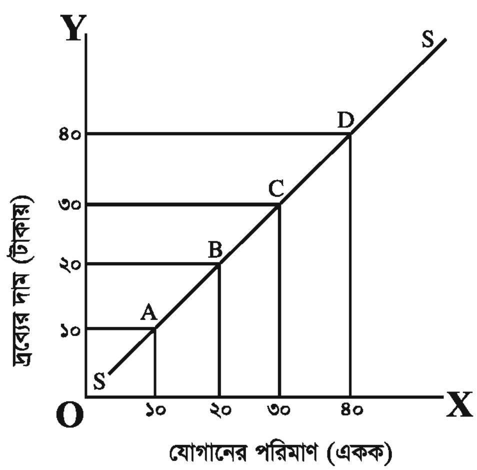
যোগান সূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০.০০	১০ একক
২০.০০	২০ ”
৩০.০০	৩০ ”
৪০.০০	৪০ ”

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ১০ টাকা হলে তার যোগান হয় ১০ একক। দাম বেড়ে ২০ টাকা , ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণও বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০ একক, ৩০ একক ও ৪০ একক। এভাবে যোগান সূচিতে যোগান বিধি প্রতিফলিত হয়।

২.৫.৫ যোগান রেখা

কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে তার বিভিন্ন পরিমাণ যোগান যে রেখা দ্বারা দেখানো হয় তাকে যোগান রেখা বলে। যোগান সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হল যোগান রেখা। এ রেখার প্রতিটি বিন্দু দ্রব্যের এক একটি দামে ঐ দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ নির্দেশ করে। যোগান সূচির মতো যোগান রেখা থেকেও দ্রব্যের দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক জানা যায়। নিচে একটি যোগান রেখার উদাহরণ দেওয়া হল :



রেখা চিত্রে OX ভূমি অক্ষে দ্রব্যের যোগান ও OY লম্ব অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে। SS হল যোগান রেখা। এ রেখার A বিন্দুতে ১০ টাকা দামে দ্রব্যের যোগান ১০ একক। B, C ও D বিন্দুতে যথাক্রমে ২০ টাকা দামে যোগান ২০ একক, ৩০ টাকা দামে যোগান ৩০ একক এবং ৪০ টাকা দামে যোগান ৪০ একক। দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকায় যোগান রেখা সাধারণত বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে থাকে।

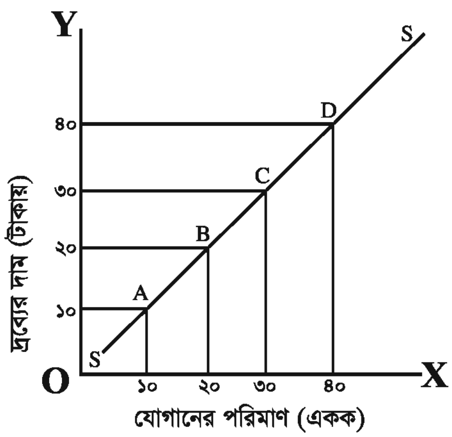
২.৫.৬ যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অংকন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিক্রেতা দ্রব্যটি যে বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দেয় তা একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলে তাকে যোগান সূচি বলে। এ যোগান সূচিকে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে যোগান রেখা বলে। সুতরাং একটি যোগান সূচির ভিত্তিতে একটি যোগান রেখা অংকন করা যায়। নিচে একটি যোগান সূচি দেওয়া হল এবং এ সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অংকন করা হল।

যোগান সূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০.০০	১০ একক
২০.০০	২০ ”
৩০.০০	৩০ ”
৪০.০০	৪০ ”

উপরের কাল্পনিক যোগান সূচি অনুযায়ী এক জন বিক্রেতা ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা দামে যথাক্রমে ১০ একক, ২০ একক, ৩০ একক ও ৪০ একক দ্রব্য যোগান দেয়। এখন এ যোগান সূচির ভিত্তিতে নিচে একটি যোগান রেখা অংকন করা হল।



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন ১০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ হল ১০ একক। এখন লম্ব অক্ষের ১০ সূচক বিন্দু এবং ভূমি অক্ষের ১০ সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব আঁকা হলে এরা পরস্পর A বিন্দুতে মিলিত হয়। A বিন্দুটি যোগান রেখার একটি বিন্দু। দাম বেড়ে ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ২০ একক, ৩০ একক ও ৪০ একক হয়। আগের মতোই OY অক্ষের ২০, ৩০ ও ৪০ সূচক বিন্দুগুলো এবং OX অক্ষের ২০, ৩০ ও ৪০ সূচক বিন্দুগুলো থেকে লম্ব আঁকলে সেগুলো যথাক্রমে B, C ও D বিন্দুতে মিলিত হয়। এখন দাম ও যোগানের পরিমাণ নির্দেশক A, B, C ও D বিন্দুগুলো যোগ করলে SS রেখাটি পাওয়া যায়। এটিই যোগান রেখা। দাম ও যোগানের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকায় যোগান রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে।

২.৫.৭ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

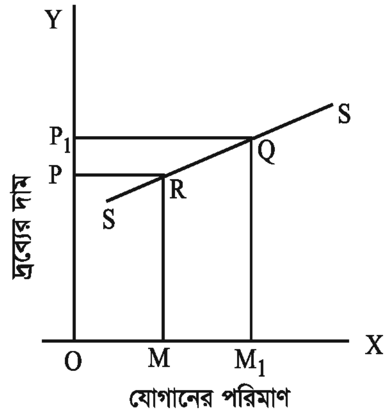
যোগান বিধি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম বাড়লে তার যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কিন্তু দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিবর্তন সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে একরকম হয় না। কোনো কোনো দ্রব্যের দামের অল্প পরিবর্তন হলে যোগান বেশি মাত্রায় পরিবর্তিত হয়। আবার কিছু কিছু দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের ব্যাপক হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও যোগান সামান্য কমবেশি হয়। এভাবে দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির যোগান যে বেশি বা অল্প হারে পরিবর্তিত হয়, সে হারকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা বলে।

$$\text{সূত্রাকারে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}।$$

২.৫.৮ স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক যোগান

১. স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় যোগান :

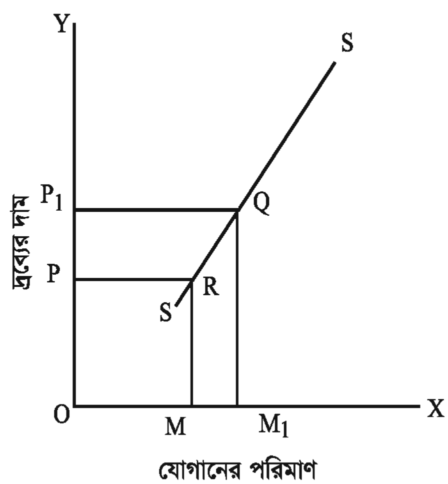
দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগান পরিবর্তনের হার বেশি হলে সে যোগানকে স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় যোগান বলে। যেমন, সাধারণত শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক। কেননা, দাম একটু বাড়লে এ জাতীয় দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে যোগান দেওয়া সম্ভব। তাতে বিক্রেতার মুনাফা বাড়ে। আবার দাম একটু কমলে উৎপাদনকারী যোগান হ্রাস করে তা গুদামজাত করে রাখে। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে স্থিতিস্থাপক যোগান ব্যাখ্যা করা হল :



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের যোগান এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম OP থেকে OP_1 এ বৃদ্ধি পাওয়ায় যোগান OM থেকে বেড়ে OM_1 হয়েছে। এখানে দাম পরিবর্তন অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তন বেশি। অর্থাৎ $MM_1 > PP_1$। সুতরাং এটি স্থিতিস্থাপক যোগান।

২. অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় যোগান :

দ্রব্যের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগান পরিবর্তনের হার কম হলে সে যোগানকে অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় যোগান বলে। সাধারণত কৃষিজাত ও পচনশীল দ্রব্যাদির যোগান অস্থিতিস্থাপক। কেননা, এসব দ্রব্য অল্প সময়ের মধ্যে ইচ্ছামতো উৎপাদন করা যায় না, আবার দীর্ঘকাল সংরক্ষণও করা যায় না। সে জন্য দাম বেশি বাড়লেও এ ধরনের দ্রব্যের যোগান ইচ্ছামতো বাড়ানো যায় না। আবার দাম বেশি কমলেও এসব দ্রব্যের যোগান কমিয়ে মজুদ করা যায় না। অর্থাৎ দাম বেশিমাত্রায় বাড়লে বা কমলে এসব দ্রব্যের যোগান সে হারে বাড়ানো বা কমানো যায় না। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে অস্থিতিস্থাপক যোগান ব্যাখ্যা করা হল :



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে যোগান ও লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম OP থেকে OP_1 এ বৃদ্ধি পাওয়ায় যোগান OM থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OM_1 হয়েছে। এখানে দামের পরিবর্তন অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তন কম। অর্থাৎ $MM_1 < PP_1$। সুতরাং এটি অস্থিতিস্থাপক যোগান।

২.৬.১ জাতীয় আয়

দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ফলে প্রতিবছর যে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে সাধারণভাবে জাতীয় আয় বলে। অর্থাৎ একটি দেশে একবছর কালের মধ্যে উৎপাদিত চাল, ডাল, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি দ্রব্যের আর্থিক মূল্য এবং চিকিৎসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি সেবার আর্থিক মূল্য একত্রে যোগ করে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। সমাজের অফুরন্ত চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদিত হয়। এ জন্যই জাতীয় আয় একটি স্থায়ী ভাণ্ডার নয়, এটি একটি অবিরাম প্রবাহ। জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন বলেন, "কোনো দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের বার্ষিক প্রবাহের মোট আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।"[৬]

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

জাতীয় আয়কে নানাভাবে প্রকাশ করা যায়। এ জন্য জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। নিচে এসব ধারণা সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একবছরে দেশের সকল উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় মধ্যবর্তী দ্রব্য ও সেবা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা ধরা হয়। মধ্যবর্তী দ্রব্য ও সেবা হচ্ছে ঐগুলো যা অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর যেসব দ্রব্য ও সেবা অন্য দ্রব্য ও সেবার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় না তাকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলে। যেমন, ময়দা হল মধ্যবর্তী দ্রব্য এবং রুটি চূড়ান্ত দ্রব্য। এখানে মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় কেবল রুটিকেই হিসাবের মধ্যে ধরা হবে। উল্লেখ্য, একটি দেশের একবছরের মোট জাতীয় উৎপাদনকে সাধারণত আর্থিক মূল্যে প্রকাশ করা হয়।

খ. নীট জাতীয় উৎপাদন

মোট জাতীয় উৎপাদন সৃষ্টিতে যে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সেগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়। উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা প্রয়োজন। এ জন্য কিছু অর্থ খরচ হয়। এ খরচকে ক্ষতিপূরণমূলক খরচ বা অবচয়জনিত খরচ বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে এ ক্ষয়ক্ষতির খরচ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। অর্থাৎ নীট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন - ক্ষয়ক্ষতির খরচ। সুতরাং নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব থেকেই দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। একবছরের নীট জাতীয় উৎপাদনকেও আর্থিক মূল্যে প্রকাশ করা হয়।

গ. মোট দেশজ উৎপাদন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একবছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে। মোট দেশজ উৎপাদন হিসাব করার সময় দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ থেকে উৎপাদিত সব রকমের দ্রব্য ও সেবাকর্ম ধরা হয়। কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন ধরা হয় না। দেশের বার্ষিক মোট দেশজ উৎপাদনকে সাধারণত আর্থিক মূল্যে প্রকাশ করা হয়।

২.৬. ৩ মাথাপিছু আয়

দেশের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। সুতরাং মাথাপিছু আয় = মোট জাতীয় আয় ÷ মোট জনসংখ্যা। মাথাপিছু আয় থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জনগণের

---

৬. "Natoinal income is the money measure of the annual flow of goods and services in an economy."- P.A. Samuelson

জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুব কম। এ দেশে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে স্বল্প উৎপাদনের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কম। তাই মাথাপিছু আয়ও কম। স্বল্প মাথাপিছু আয়ের কারণে আমাদের জীবনযাত্রার মান নিচু। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় নিচের তালিকায় দেখানো হল।

দেশ	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)
১. সুইজারল্যান্ড	৫৭,২৩০
২. জার্মানি	৩৬,৬২০
৩. ফ্রান্স	৩৬,৫৫০
৪. যুক্তরাষ্ট্র	৪৪,৯৭০
৫. জাপান	৩৮,৪১০
৬. কোরিয়া রিপাবলিক	১৭,৬৯০
৭. শ্রীলংকা	১৩০০
৮. পাকিস্তান	৭৭০
৯. ভারত	৮২০
১০. বাংলাদেশ	*৫২০
১১. নেপাল	২৯০
১২. ভুটান	১৪১০
১৩. উগান্ডা	৩০০
১৪. তিউনেশিয়া	২৯৭০

উৎস : http://www.finfacts.com/biz10/globalworldincomepercapita.htm এবং

* বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক–২০০৭

২.৬.৪ জাতীয় আয়ের বণ্টন

অর্থনীতিতে বণ্টন বলতে উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে জাতীয় আয়ের ভাগ হওয়াকে বোঝায়। দেশে উৎপাদনের চারটি উপাদান যেমন, ভূমি, শ্রম,মূলধন ও সংগঠন মিলিতভাবে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হয়ে সাধারণত এক বছরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জাতীয় আয় সৃষ্টি করে। এ জাতীয় আয় অর্থনৈতিক নিয়মেই ঐ চারটি উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। উৎপাদনে অংশগ্রহণের মূল্য হিসেবে ভূমির মালিক পায় খাজনা, শ্রমিক পায় মজুরি, মূলধনের মালিক পায় সুদ এবং সংগঠক বা উদ্যোক্তা পায় মুনাফা। এভাবে উপাদানসমূহের মধ্যে জাতীয় আয় ভাগ হয়ে যায়। একটি দেশের জাতীয় আয় উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে এভাবে ভাগ হয়ে যাওয়াকে জাতীয় আয়ের বণ্টন বলা হয়।

২.৬.৫ বাংলাদেশে আয় বণ্টন

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম। আয় বৃদ্ধির প্রবণতা খুব মন্থর। কিন্তু সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টনে চরম অসমতা বিদ্যমান। দেশের অধিকাংশ সম্পদ ও আয় মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত। এ শ্রেণীটি বেশিরভাগ কৃষি জমি, কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের মালিক। অন্যদিকে প্রায় ৮৫ শতাংশ গ্রামীণ দরিদ্রদের হাতে তেমন কোনো সম্পদ নেই। আমাদের গড় মাথাপিছু আয় বর্তমানে *৫২০ ডলার হলেও এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় মাথাপিছু আয় ১১০ ডলারেরও কম। এ জনগোষ্ঠী জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

দেশের শহর ও গ্রামের জনগণের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টনে উল্লেখযোগ্য অসমতা রয়েছে। শহরে বসবাসরত উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত লোক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য বেতন ভাতা এবং আয়ের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

ফলে তাদের মাথাপিছু আয় কিছুটা বেশি। অন্যদিকে অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণের জন্য এসব সুবিধা না থাকায় তাদের মাথাপিছু আয় কম। সম্প্রতি কাজের অভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রামীণ পরিবার শহরাঞ্চলে পাড়ি জমাচ্ছে। সেখানেও উপযুক্ত কাজ না পেয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ কারণে গ্রামাঞ্চলের মতো শহরেও প্রকট আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী প্রায় ৩৭ ভাগ পরিবার প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম খাদ্য ও ক্যালরি গ্রহণ করে। মাত্র ২০ ভাগ মানুষ স্বাস্থ্য সুবিধা পায়। বিশুদ্ধ পানি পায় মাত্র ৪৩ ভাগ লোক। বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের এরূপ অসম বণ্টন আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা।

২.৭.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর আদান প্রদানকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বের কোনো একটি দেশের সাথে অন্য একটি বা একাধিক দেশের দ্রব্যসামগ্রীর যে লেনদেন হয় তাকে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। যেমন, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি করে এবং সেসব দেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এভাবে ভারত, চীন, জাপান, জার্মানিসহ বহুসংখ্যক দেশের সাথে বাংলাদেশ দ্রব্যসামগ্রী লেনদেন করে। এ ধরনের বাণিজ্যই হল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গঠিত।

একটি দেশের জনগণের জন্য অনেক রকম দ্রব্যসামগ্রী প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে দেশটি প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সুবিধানুযায়ী অল্প কয়েকটি দ্রব্য ভালোভাবে ও কম খরচে উৎপাদন করতে পারে। অন্যান্য দ্রব্য সহজে ও কম খরচে উৎপাদন করতে পারে না। এভাবে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে উঠে। পরিণামে বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনমতো দ্রব্যসামগ্রী আদান প্রদান করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্বের দেশগুলোর নানাবিধ দ্রব্যের অভাব পূরণে সহায়তা করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২.৭.২ বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যসমূহ

প্রতিবেশী দেশগুলোসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য চালু রয়েছে। যেসব দ্রব্য এ দেশে সহজে ও বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়, সেগুলো আমরা বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। আর অন্যান্য অনেক রকম দ্রব্যসামগ্রী আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকি। এ দেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

রপ্তানি দ্রব্যসমূহ

স্বাধীনতার আগে ও পরে কয়েক বছর পর্যন্ত এ দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। এ দুটো পণ্য রপ্তানি করে তখন সোনার মতো মূল্যবান প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হত। সে জন্যই তদানীন্তনকালে পাটকে বাংলাদেশের "সোনালি আঁশ" বলা হত। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের গঠন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য হল তৈরি পোশাক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪৬০০ পোশাক তৈরির কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় তৈরি বিভিন্ন রকম পোশাক প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। আমরা বর্তমানে আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশ কেবল তৈরি পোশাক থেকেই আয় করে থাকি।

তৈরি পোশাক ছাড়া এ দেশের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য হল- পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত চিংড়ি, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, কাঁচা পাট, চা, নিউজপ্রিন্ট, হোসিয়ারি দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, ফলমূল, রাসায়নিক সার প্রভৃতি।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্বের ১০৭টি দেশে প্রায় ১০০টির বেশি পণ্য রপ্তানি করে। তবে এর মধ্যে ৭টি দেশে রপ্তানির পরিমাণ বেশি। এ দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হল যুক্তরাষ্ট্র। এরপরে রয়েছে জার্মানি, ইংল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও বেলজিয়াম।

আমদানি দ্রব্যসমূহ

বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত। খাদ্যেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণ মূলধন দ্রব্য দরকার। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য হল খাদ্য, শিল্পজাত ভোগ্য পণ্য, মূলধন দ্রব্য ও শিল্পের কাঁচামাল।

খাদ্যজাত আমদানি দ্রব্যের মধ্যে গম, চাল, শিশু খাদ্য, ভোজ্য তেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে বস্ত্র, ওষুধ, সিমেন্ট, সার, পরিবহন যান, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, জ্বালানি, রেল ও মোটরগাড়ি এবং অসংখ্য শিল্পজাত দ্রব্য। শিল্পের কাঁচামালের মধ্যে তুলা, সুতা, জ্বালানি তেল, কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, কৃত্রিম তন্তু, রবার, রং, পেট্রোলিয়াম দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করে। এসব দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে লোহা, ইস্পাত, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, খনিজ পণ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন প্রকার আনুষঙ্গিক উপকরণ। আমাদের আমদানি পণ্যগুলো প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, রাশিয়া, জার্মানি, কানাডা, ভারত, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মনুষ্য সৃষ্ট সম্পদ মূলত :

ক. নদনদী　　খ. প্রতিভা
গ. সেচ ব্যবস্থা　　ঘ. সুন্দরবন

২। এক জন ভোক্তার দুইটি আম ভোগের ফলে তার মোট উপযোগের পরিমাণ হল ১০ টাকা। ৩টি আম ভোগের ফলে যদি মোট উপযোগ ১২ টাকা হয় তাহলে আমের প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ হবে -

ক. ২ টাকা　　খ. ৪ টাকা
গ. ৫ টাকা　　ঘ. ৬ টাকা

৩। মানব জীবনে অভাবের বৈশিষ্ট্য হল -

ক. অভাব সর্বদা একটা নিয়ম মেনে চলে　　খ. অভাব চক্রাকারে আবর্তিত হয়
গ. অভাবগুলো পরস্পরের সহযোগী　　ঘ. অভাব অসীম তবে বিশেষ অভাব সসীম

৪। দ্রব্যের দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদা ৪ একক। দাম কমে ৬ টাকা ও ৪ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে হয় যথাক্রমে ৮ ও ১২ একক। এ থেকে আমরা বলতে পারি –

i. দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখি
ii. দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে
iii. দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. iii

৫। নিচের কোন চিত্রটি সর্বোত্তমভাবে চাহিদা বিধিকে প্রতিনিধিত্ব করে ?
(P = দ্রব্যের দাম এবং Qd = দ্রব্যের চাহিদা)

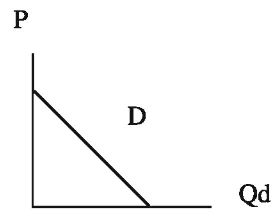


Fig - 1

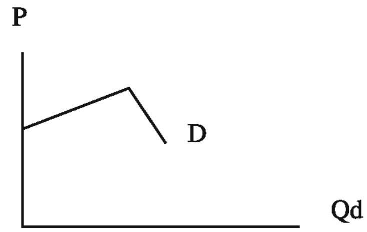


Fig - 2

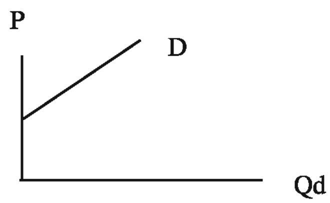


Fig - 3

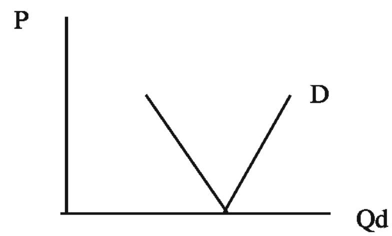


Fig - 4

ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 4

৬। করিম নামে এক জন ফল বিক্রেতা তাঁর ফলসহ বাজারে গিয়ে দেখতে পান যে, একটি বিশেষ ফলের দাম তাঁর প্রত্যাশা অপেক্ষা ৫ টাকা বেশি। বাজারের এই অবস্থা দেখে তিনি তাঁর গুদাম থেকে আরো বেশি পরিমাণে আলোচ্য পণ্যটি বাজারে নিয়ে আসেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে-

i. চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সর্বদা সরবরাহও বৃদ্ধি পায়
ii. উচ্চ মূল্যের ফলে সৃষ্ট বর্ধিত লাভ সরবরাহকারীদেরকে বেশি সরবরাহ করতে উৎসাহিত করেছে
iii. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দাম এবং দ্রব্যের সরবরাহ একে অপরের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত

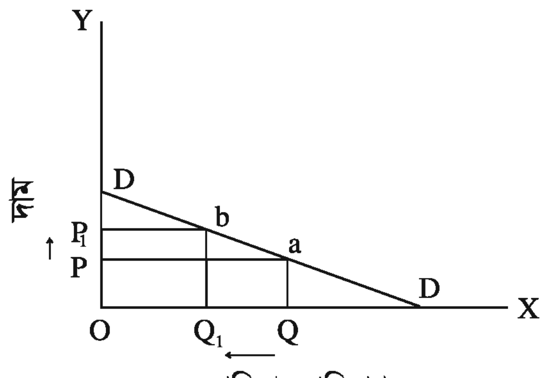
কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৭। শহিদ বাজারে মাংস কিনতে গিয়ে দেখল মাছের দাম মাংসের দামের চেয়ে কম। তাই সে মাছ কিনল। এ ক্ষেত্রে মাছ –

ক. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খ. বিকল্প দ্রব্য
গ. পরিপূরক দ্রব্য ঘ. বিলাস দ্রব্য

নিচের চিত্রটি দেখ এবং ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



৮। উপরের চিত্রে DD হল –

ক. যোগান রেখা খ. প্রান্তিক উপযোগ রেখা

গ. চাহিদা রেখা ঘ. প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

৯। চিত্রে দেখা যায় $QQ_1 > PP_1$। এটি কোন ধরনের চাহিদাকে নির্দেশ করে ?

ক. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা খ. স্থিতিস্থাপক চাহিদা

গ. অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা ঘ. শূন্য স্থিতিস্থাপক চাহিদা

১০। বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকর্মসহ একটি দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকর্মকে বলা হয় –

ক. মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন খ. মোট জাতীয় উৎপাদন

গ. নীট জাতীয় উৎপাদন ঘ. প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন

১১। ২০০৭ সালে 'ক' দেশের মাথাপিছু আয় এবং মোট জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ৫০০ টাকা এবং ৬০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত বছরে 'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ছিল।

ক. ১.২০ খ. ৪.৮

গ. ৬.০ ঘ. ১০.৮

১২। ভোক্তার মাথাপিছু আয় বাড়ার ফলে তার-

i. ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

ii. জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়

iii. সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

নিচের সারণিটি দেখ। সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে ১৩ এবং ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

২০০১-২০০২ এবং ২০০৪-২০০৫ সালে সার্ক দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি (মিলিয়ন টাকা)

সার্কভুক্ত দেশ	২০০১-২০০২	২০০৪-২০০৫
ভুটান	২	৩
ভারত	১২৩৮	২৩৪৪
মালদ্বীপ	০	০
নেপাল	৫	২৮
পাকিস্তান	১৫৭১	১৫৯৮
শ্রীলংকা	৮৭	৮৪
মোট	২,৯০৩	৪,০৫৭

১৩। ২০০১-২০০২-এর তুলনায় ২০০৪-২০০৫ সালে কোন সার্ক দেশে বাংলাদেশ পাঁচগুণ বেশি রপ্তানি করেছে ?

ক. নেপাল খ. ভুটান

গ. মালদ্বীপ ঘ. পাকিস্তান

১৪। ২০০১-২০০২ এবং ২০০৪-২০০৫ সালে সার্ক দেশসমূহে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোন উক্তিসমূহ সঠিক ?

i. ২০০৪-০৫ সালে সার্ক দেশসমূহের মধ্যে ভারত ছিল সবচেয়ে বড় আমদানিকারক দেশ

ii. ২০০৪-০৫ সালের তুলনায় ২০০১-০২ সালে শ্রীলংকায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি ছিল

iii. প্রতি বছরই বাংলাদেশ থেকে প্রত্যেক সার্ক দেশগুলোতে কিছু না কিছু রপ্তানি হয়েছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দালানকোঠা, যন্ত্রপাতির যেমন মূল্য রয়েছে তেমনি শিক্ষকতা, চিকিৎসা প্রভৃতি সেবারও আর্থিক মূল্য রয়েছে। একটি দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় মোট জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট দেশজ উৎপাদনের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করে নিতে হয়। বাংলাদেশে জাতীয় আয় বণ্টনে অসম অবস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ২০০১ সালে আমাদের দেশের গড় মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৩৭৭ ডলার যা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় কম।

ক. জাতীয় আয় কী?

খ. মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

গ. বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কীভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব ?

ঘ. "একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন অপরিহার্য"- এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

২। নিম্নে ১টি পণ্যের যোগান সূচি দেখানো হল-

দাম (প্রতি একক)	যোগানের পরিমাণ
১০ টাকা	২০০ একক
২০ টাকা	২৫০ একক
৩০ টাকা	৩০০ একক
৪০ টাকা	৩৫০ একক

ক. যোগান সূচি কাকে বলে?

খ. উপরের সূচির আলোকে যোগান বিধি ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরোক্ত যোগান বিধিটি বাংলাদেশে আলুর যোগানের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর তা বিশ্লেষণ কর।

৩। সাভারে রমেশের মিষ্টির সুনাম আছে। তিনি প্রায় ৩০ বছর যাবত সততার সাথে তাঁর ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর সম্পদের বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। বর্তমানে প্রায় ৫০ জন লোক তাঁর মিষ্টির দোকানে কাজ করে। এর মধ্যে কেউ উৎপাদন আবার কেউ বিক্রীর কাজে ব্যস্ত থাকে। অন্য দিকে রমেশের ব্যবসাটি অর্থনীতিতে বেশ প্রভাব ফেলছে। অনেক ব্যবসায়ী রমেশের ব্যবসাটি ক্রয় করতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

ক. সম্পদ কী?

খ. সম্পদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে রমেশের মিষ্টির ব্যবসা কীভাবে দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রমেশের ব্যবসার সুনাম কি অর্থনৈতিক সম্পদ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাদন
PRODUCTION

৩.১.১ উৎপাদন

সাধারণ অর্থে কোনো বস্তু সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। পৃথিবীর সব বস্তু মৌলিকভাবে প্রকৃতি প্রদত্ত তাই মানুষ নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে কেবল প্রকৃতির দেওয়া কোনো বস্তুর রূপ বা আকৃতি কিংবা স্থান পরিবর্তন করে তার নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে মানুষ নিজের বুদ্ধি ও কারিগরি জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি প্রদত্ত কোনো বস্তুতে অতিরিক্ত উপযোগের সংযোজন ঘটাতে পারে। অর্থনীতিতে এ অতিরিক্ত বা নতুন উপযোগ সৃষ্টি বা সংযোজন করাকে উৎপাদন বলে। যেমন, তুলা থেকে কাপড় প্রস্তুতের অর্থ কোনো দ্রব্য সৃষ্টি নয়, বরং তাতে অতিরিক্ত বা নতুন উপযোগের সংযোজন। অর্থনীতিবিদ ফ্রেসার বলেন, "উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বোঝায়।"[১] অর্থনীতিবিদদের মতে, সৃষ্ট এ উপযোগের বিনিময় মূল্য থাকতে হবে অর্থাৎ তা বিক্রয়যোগ্য হতে হবে। সুতরাং অর্থনীতিতে উৎপাদনের অর্থ হল বস্তু সৃষ্টি নয়, বরং বস্তুর অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি, যে উপযোগের বিনিময় মূল্য আছে।

৩.১.২ উৎপাদনের প্রকারভেদ

প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর সাথে অতিরিক্ত উপযোগ সংযোজন করাকে উৎপাদন বলে। উৎপাদন অর্থাৎ উপযোগ সৃষ্টির এ প্রক্রিয়া নানাভাবে সংঘটিত হতে পারে। উপযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, ১. রূপগত উপযোগ, ২. স্থানগত উপযোগ, ৩. সময়গত বা কালগত উপযোগ, ৪. সেবাগত উপযোগ ও ৫. স্বত্বগত বা মালিকানাগত উপযোগ।

১. রূপগত উপযোগ : প্রকৃতি প্রদত্ত কোনো বস্তুর আকৃতি বা রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে রূপগত উপযোগ বলে। যেমন, কাঠের তক্তার রূপ পরিবর্তন করে চেয়ার তৈরি করলে তার উপযোগ বাড়ে।

২. স্থানগত উপযোগ : কোনো বস্তু একজায়গা থেকে অন্যজায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়তে পারে। একে স্থানগত উপযোগ বলে। যেমন, বনের কাঠ শহরে আনলে তার উপযোগ বাড়ে।

৩. সময়গত বা কালগত উপযোগ : সময়ের ব্যবধানের ফলেও অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট এ উপযোগকে সময়গত বা কালগত উপযোগ বলে। যেমন, পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে রেখে দিলে তা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বেশি দামে বিক্রি করা যায়।

৪. সেবাগত উপযোগ : মানুষ তার শ্রম বা সেবামূলক কাজের দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে। যেমন, গায়ক গান গেয়ে এবং ডাক্তার সেবা দিয়ে, সেবাগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

৫. স্বত্বগত বা মালিকানাগত উপযোগ : দ্রব্যের মালিকানা বা স্বত্বের পরিবর্তন ঘটলে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয়। একে স্বত্বগত বা মালিকানাগত উপযোগ বলে। যেমন, কোনো পরিত্যক্ত বাড়ির মালিকানা কেউ আইনগতভাবে লাভ করলে তার উপযোগ বাড়ে।

৩.১.৩ উৎপাদনের উপকরণ

কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব বস্তু বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উৎপাদনের উপরকণ বলে। উৎপাদনের চারটি প্রধান উপকরণ রয়েছে, যেমন, ১. ভূমি, ২. শ্রম, ৩. মূলধন ও ৪. সংগঠন।

---

১. " Production means putting utility into."- Fraser

১. ভূমি : উৎপাদনে সাহায্য করে এ ধরনের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। মাটি, মাটির উর্বরাশক্তি, খনিজদ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সবরকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্গত।

২. শ্রম : উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। এ অর্থে জেলে বা ঠেলাগাড়ির চালকের শারীরিক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি ডাক্তার বা উকিলের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রম।

৩. মূলধন : যেসব দ্রব্যসামগ্রী মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত এবং সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় অর্থনীতিতে সেগুলোকে মূলধন বলে। অর্থাৎ, মূলধন হল উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। মূলধন প্রকৃতির দান নয়, এটি মনুষ্যসৃষ্ট। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কলকারখানা প্রভৃতি হল মূলধন।

৪. সংগঠন : উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রিত করে ও তাদের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। এ কাজ যে ব্যক্তি সম্পাদন করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রিকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা এসবই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কিছু উৎপাদনে ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন -এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটির অভাব হলে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থা ভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধন ও সংগঠনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি। আবার যুক্তরাষ্ট্র শিল্প প্রধান দেশ বলে সেখানে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধন ও সংগঠনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

৩.২.১ ভূমি

সাধারণ কথায় ভূমি বলতে পৃথিবীর স্থলভাগ বা ভূপৃষ্ঠকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে ভূপৃষ্ঠসহ সবরকম প্রাকৃতিক সম্পদকেই বোঝায় যা প্রকৃতির দান এবং যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না, এমন সবই ভূমির অন্তর্গত। এ অর্থে ভূপৃষ্ঠের মাটি ও তার উর্বরতা, বৃষ্টিপাত, সূর্যকিরণ, তাপ, আর্দ্রতা, নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, জলবায়ু প্রভৃতি প্রকৃতির সমস্ত দানই ভূমি। ভূমির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেন, "ভূমির অর্থ হল সেসব পদার্থ ও শক্তি যা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যের জন্য স্থল, পানি, বায়ু, আলো ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্ত হাতে দান করে।"[২] সুতরাং উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত সবরকম প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলা হয়।

৩.২.২ ভূমির বৈশিষ্ট্য

উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপকরণ হিসেবে ভূমির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন :

১. ভূমি প্রকৃতির দান : ভূমি মনুষ্যসৃষ্ট নয়, এটি প্রকৃতির দান। ভূপৃষ্ঠ, নদনদী, সমুদ্র, আলো, সূর্যকিরণ সবই প্রকৃতির সৃষ্টি বলে এগুলো ভূমি।

২. ভূমির উৎপাদন ব্যয় নেই : মানুষের শ্রম ছাড়াই ভূমি সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর কোনো উৎপাদন খরচ নেই।

৩. ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ : ভূমি প্রকৃতি প্রদত্ত। তাই মূল্য যতই কম বেশি হোক না কেন, ভূমির যোগান বাড়েও না কমেও না। এ জন্য বলা হয়, ভূমির যোগান স্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ।

৪. ভূমি স্থানান্তরযোগ্য নয় : ভূমি একজায়গা থেকে অন্যজায়গায় স্থানান্তর করা যায় না। এটি উৎপাদনের একটি অনড় উপকরণ।

---

2. "Land means the materials and the forces which nature gives freely for man's aid, in land and water, in air, in light and heat."- A. Marshall.

৫. ভূমি একটি নিষ্ক্রিয় উপকরণ : ভূমি নিজে কোনো কিছু উৎপাদন করতে পারে না। কর্ষণ ছাড়া কোনো ভূমিতে ফসল উৎপাদিত হয় না।

৬. ভূমি চিরস্থায়ী : ভূমি অবিনশ্বর। ভূমি আবহমানকাল ধরে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৭. ভূমির গুণের লক্ষণীয় ভিন্নতা : সব ভূমি একইরকম নয়। কোনো ভূমি বেশি উর্বর, কোনো ভূমি কম উর্বর, আবার কোনো ভূমি একেবারে উষর।

৮. ভূমি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির অধীন : উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণ নিয়োগের তুলনায় উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ার প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। অন্যান্য উপকরণের বেলায় উৎপাদন বাড়ার এ প্রবণতা দেখা গেলেও ভূমির ক্ষেত্রে তা দ্রুত কার্যকর হয়।

৩.২.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উপকরণের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপকরণ যে হারে বাড়ানো হয়, উৎপাদন সাধারণত তার চেয়ে কম হারে বাড়ে। অর্থাৎ উপকরণ বাড়ানোর ফলে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের তুলনায় উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। বিধিটি বর্ণনা প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেন, “ কোনো একটি নির্দিষ্ট জমিতে কৃষিকাজের জন্য শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হলে সাধারণত উৎপাদন বাড়ার পরিমাণ সমানুপাতিক হারের চেয়ে কম হয়, অবশ্য এর মধ্যে যদি কৃষি উৎপাদন কৌশলের কোনো উন্নতি না ঘটে।”[৩]

সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে গেলে এ নিয়মটি লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, প্রথমদিকে উপকরণ বা খরচ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়তে পারে। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত বেশি পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করা হতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। একটি গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে বিধিটি ব্যাখ্যা করা যায়।

উপকরণ সংমিশ্রণ	ভূমি	শ্রম ও মূলধন খরচ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	* ১ হেক্টর	১০০.০০	* ১০ কুইন্টাল	১০ কুইন্টাল
B	১ ”	২০০.০০	২২ ”	১২ ”
C	১ ”	৩০০.০০	৩০ ”	৮ ”
D	১ ”	৪০০.০০	৩৪ ”	৪ ”

উপরের তালিকায় নির্দিষ্ট ১ হেক্টর জমিতে সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন ক্রমাগত নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমদিকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে তা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। অর্থাৎ সংমিশ্রণ A অনুযায়ী প্রথমবার ১ হেক্টর জমিতে ১০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই ১০ কুইন্টাল হয়। দ্বিতীয়বার সংমিশ্রণ B অনুযায়ী, একই জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ দ্বিগুণ করলে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২২ কুইন্টাল ও ১২ কুইন্টাল। এক্ষেত্রে খরচ বাড়ার তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হারে বেড়েছে। তবে তৃতীয়বার সংমিশ্রণ C অনুযায়ী একই জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ তিন গুণ করলে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যায় যথাক্রমে ৩০ কুইন্টাল ও ৮ কুইন্টাল। এখানে অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন, খরচ বাড়ার তুলনায় কম হারে বেড়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে এ পর্যায় থেকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। পরবর্তী উৎপাদনে যদি D সংমিশ্রণ ব্যবহৃত হয় তাহলে দেখা যায়, খরচ বাড়ার তুলনায় প্রান্তিক

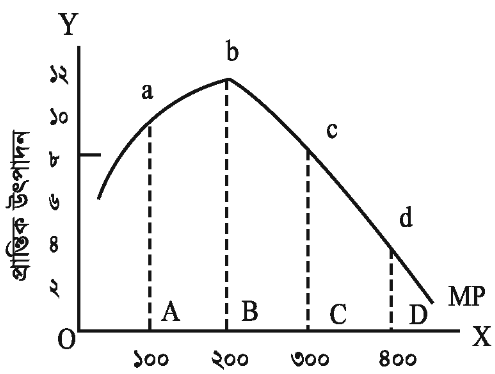
---

* ১ হেক্টর = ২.৪৭ একর   * ১ কুইন্টাল = ১০০ কেজি

3. "An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes, in general, a less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture." - A. Marshall

উৎপাদন আগের চেয়ে কম হারে বেড়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণ খরচের তুলনায় কম পরিমাণে উৎপাদন বাড়ার প্রবণতাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি হিসেবে পরিচিত।

রেখাচিত্রের সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা : রেখাচিত্রের সাহায্যেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা যায়।



শ্রম ও মূলধন খরচ (টাকায়)

প্রদত্ত চিত্রে OX অক্ষে শ্রম ও মূলধন খরচের পরিমাণ এবং OY অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখান হয়েছে। এখানে শ্রম ও মূলধন খরচের সব এককগুলো হল OA (১০০), AB (১০০), BC (১০০) ও CD (১০০) এবং এদের প্রান্তিক উৎপাদন হল যথাক্রমে Aa(১০) Bb(১২), Cc(৮), Dd(৪)। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে একটি রেখা MP টানি। এটি প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। দেখা যায়, b বিন্দুর পর থেকে রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। OB পরিমাণ অর্থাৎ ২০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পর ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

বিধিটির ব্যতিক্রম : ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কতকগুলো ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না :

১. পরিবর্তনীয় উপকরণগুলোর খরচ বৃদ্ধির সাথে যদি উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় তাহলে বিধিটি কার্যকর হয় না।

২. প্রাকৃতিক কারণে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে বিধিটি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

৩. উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রম ও মূলধন খরচের পরিমাণ বাড়ালে তা উত্তম চাষের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয় তাই প্রথমদিকে উপকরণ খরচের তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে।

৩.৩.১ শ্রম

সাধারণ কথায় শারীরিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে শ্রম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হয় তাকেই অর্থনীতিতে শ্রম বলে। অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক আনন্দ লাভ কিংবা স্নেহদানের জন্য যে পরিশ্রম তা শ্রম নয়। যেমন, শিল্পী নিজের আনন্দের জন্য ছবি আঁকলে কিংবা বাবা-মা সন্তানকে লালন পালন করলে যে পরিশ্রম হয় তাকে শ্রম বলা যায় না। তবে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে ছবি আঁকলে অথবা সেবাদান করলে যে পরিশ্রম হয় তাকে শ্রম বলা যায়। অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেন, "মানসিক বা শারীরিক যে কোনো প্রকারের পরিশ্রম যা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের উপকার পাওয়ার জন্য করা হয় তাকে শ্রম বলে।"[৪]

৩.৩.২ শ্রমের বৈশিষ্ট্য

উৎপাদনের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে শ্রমের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলো হল :

১. শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ : শ্রমিকের জীবন আছে বলে শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ। শ্রমিক যতদিন জীবিত থাকে ততদিন শ্রমের অস্তিত্ব থাকে।

---

৪. "Any exertion of mind or body undergone, partly or wholly with a view to some good other than pleasure derived directly from the work is called Labour." A. Marshall

২. শ্রম ক্ষণস্থায়ী : ভূমি, মূলধন ইত্যাদি উপকরণ সময়মতো ব্যবহৃত না হলেও তা সংরক্ষণ করা যায়। এ জন্য সেগুলো নষ্ট হয় না। কিন্তু অব্যবহৃত শ্রম সঞ্চয় করে রাখা যায় না। শ্রম নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনে নিয়োজিত না হলে চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়।

৩. শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য : ভূমি ও মূলধনকে তাদের মালিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু শ্রমিক থেকে শ্রমকে আলাদা করা যায় না। শ্রম শ্রমিকের অঙ্গীভূত বলে শ্রম বিক্রয়ের সময় শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য।

৪. শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে, নিজেকে নয় : এক জন শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম বিক্রয় করে, নিজেকে নয়। একটি পশু ক্রয় করলে তার দেহ ও সেবার মালিক হওয়া যায়। কিন্তু মজুরির বদলে এক জন শ্রমিকের কেবল সেবাই নেওয়া যায়, তার দেহ ও মনের ওপর অধিকার জন্মায় না।

৫. শ্রমের যোগানের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ : শ্রমের যোগান জনসংখ্যার আয়তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিক্ষা, শ্রমের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। তাই মজুরি বাড়ানোর সাথে সাথে শ্রমের যোগান বাড়ানো যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি মজুরি কমলে তার যোগানও কমানো যায় না।

৬. শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা কম : শ্রম ক্ষণস্থায়ী এবং সংরক্ষণের অযোগ্য বলে অব্যবহৃত শ্রম চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রমের এ ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের জন্যই শ্রমিক নিয়োগকর্তার সাথে মজুরির হার নিয়ে বেশি দরকষাকষি করতে পারে না। তাই সে খুব কম মজুরিতেও কাজ করতে বাধ্য হয়।

৭. মজুরির হারের সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক বিপরীত : দ্রব্যের দাম বাড়লে তার যোগান বেশি হয় এবং দাম কমলে যোগান কমে যায়। কিন্তু শ্রমের বেলায়, মজুরি বাড়লে অবসর যাপনের জন্য শ্রমিকরা কম শ্রম দান করে। আবার মজুরি কমলে আয় বাড়ানোর জন্য বেশি শ্রম দান করে।

৮. শ্রম গতিশীল : বেশি মজুরিতে শ্রমিক একজায়গা থেকে অন্যজায়গায়, একপেশা থেকে অন্যপেশায় এবং একই পেশার একস্তর থেকে অন্যস্তরে যেতে পারে। তাই শ্রম গতিশীল।

৯. শ্রম সক্রিয় উপকরণ : ভূমি ও মূলধন নিজে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে না বলে নিষ্ক্রিয় উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়। মানুষ কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করলেই কেবল তারা উৎপাদন করতে পারে। তাই শ্রম একটি সক্রিয় উপকরণ।

৩.৩.৩ শ্রমের যোগান

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের কর্মক্ষম ব্যক্তিরা বিভিন্ন মজুরিতে যে পরিমাণ শ্রম বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে সে দেশের শ্রমের যোগান বলে। এক জন শ্রমিকের ১ ঘণ্টার কাজকে এক শ্রম একক অর্থাৎ ১ শ্রম ঘণ্টা ধরলে বলা যায়, প্রচলিত বিভিন্ন মজুরিতে কর্মক্ষম ব্যক্তিরা যত শ্রম ঘন্টা বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাই হল শ্রমের যোগান। কোনো দেশে শ্রমের যোগান প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন, ১. দেশের মোট জনসংখ্যা ২. শ্রমের দক্ষতা।

১. দেশের মোট জনসংখ্যা : কোনো দেশে জনসংখ্যাই হল শ্রমের যোগানের প্রধান উৎস। সাধারণত জনসংখ্যা বেশি হলে শ্রমের যোগানও বেশি হয়। তবে একটি দেশে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ লোক প্রভৃতি কর্মক্ষম নয় বলে গোটা জনসংখ্যাই শ্রম সরবরাহ করে না। কেবল বিভিন্ন কাজের জন্য কর্মক্ষম লোকরাই শ্রমদান করে। স্বাভাবিকভাবেই যে দেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা যত বেশি সে দেশে শ্রমের যোগান তত বেশি। আমাদের দেশে শিশুদের সংখ্যা অনেক বেশি বলে জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও শ্রমের যোগান কম।

২. শ্রমের দক্ষতা : কোনো কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে। শ্রমিক দক্ষ হলে তার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। কাজেই যে দেশের শ্রমিক যত বেশি দক্ষ সে দেশে শ্রমের যোগানও তত বেশি। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ বলে এখানে শ্রমের যোগান কম।

৩.৩.৪ শ্রমের দক্ষতার নির্ধারক বিষয়সমূহ

শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে। শ্রমের দক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শ্রমের দক্ষতা বেশি হওয়ায় সেখানে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান দুই-ই বেশি। শ্রমের দক্ষতা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে :

১. কাজ করার ক্ষমতা : প্রথমত কাজ করার সামর্থ্যের ওপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভরশীল। কাজ করার সামর্থ্য আবার নির্ভর করে শ্রমিকের শারীরিক যোগ্যতা, জলবায়ু, খাদ্য, বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক ও চরিত্রগত গুণাগুণ এবং কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর।

২. কাজ করার ইচ্ছা : কাজের ক্ষমতার সঙ্গে শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। কাজ করার ইচ্ছা কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো হল কাজের জন্য ন্যায়সঙ্গত বেতন, বেতন বৃদ্ধির সুযোগ, উন্নতির সম্ভাবনা, কাজের স্থায়িত্ব, ছুটি ও অবসর, অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রভৃতি। এসব বিষয় শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দেয়।

৩. সংগঠনের নৈপুণ্য : কারখানার পরিচালন ব্যবস্থা দক্ষ ও উচ্চমান সম্পন্ন হলে সেখানকার শ্রমিকের দক্ষতা ও কাজের ইচ্ছা সহজেই বৃদ্ধি পায়।

৪. কারখানার পরিবেশ : কারখানার চারপাশ ও ভেতরের অবস্থা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রচুর আলো, বাতাস যুক্ত হলে এবং কারখানায় শৃঙ্খলা থাকলে শ্রমিকের দেহমন সুস্থ ও সুখী থাকে। ফলে তার দক্ষতা বাড়ে।

৫. আধুনিক যন্ত্রপাতি : কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হলে শ্রমিকরা কাজে উৎসাহ বোধ করে। এর ফলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। উন্নত দেশের শ্রমিক নিত্য নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে বলে তাদের দক্ষতা অনেক বেশি।

৬. সামাজিক নিরাপত্তা : কারখানায় কাজের সময় কোনো দুর্ঘটনায় শ্রমিক পঙ্গু বা অসুস্থ হয়ে কর্মহীন হতে পারে বা তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ রকম অবস্থায় আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দান, বীমা, বৃদ্ধ বয়সে পেনসন প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা প্রচলিত থাকলে শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতার অবসান ঘটে। ফলে তাদের কর্ম দক্ষতা বাড়তে পারে।

এ ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গঠনমূলক শ্রমিক সংঘের উপস্থিতি, নিয়োগকারীর সাথে সুসম্পর্ক, কারখানার অব্যাহত উন্নতি প্রভৃতি বিষয় শ্রমিকের দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয়।

৩.৩.৫ বাংলাদেশের শ্রমিকের দক্ষতা

উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের দক্ষতা খুব কম। এ জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী।

১. উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে এ দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু। ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি কম। এ ছাড়া উষ্ণ জলবায়ু আমাদের শ্রমিকদের কাজের সামর্থ্যকে ব্যাহত করে।

২. নিম্ন মজুরি, কাজের প্রতিকূল শর্তাবলি, কাজের স্থায়িত্বহীনতা, চাকরিতে উন্নতির অভাব, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব প্রভৃতি কারণে এ দেশের শ্রমিকদের কাজে অনীহা সৃষ্টি হয়। ফলে তাদের দক্ষতা বাড়ে না।

৩. বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা নিম্নমানের ও ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই এখানকার শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা ও দক্ষতা কম।

৪. বাংলাদেশে অধিকাংশ কল-কারখানার সামগ্রিক পরিবেশ ভালো নয়। কারখানার ভেতরে আলো-বাতাসের অভাব রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কাজে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। এ রকম মন্দ পরিবেশের কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা কম হয়।

৫. আমাদের দেশে বেশিরভাগ কলকারখানায় পুরাতন ও জরাজীর্ণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন কলাকৌশলও পুরোনো এবং ব্যবহৃত কাঁচামাল নিম্নমানের। এ কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা কম।

৬. বাংলাদেশে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। দুর্ঘটনা ও অন্যান্য বিপদকালীন সময়ে শ্রমিকরা খুব কমই সাহায্য পায়। এ ছাড়াও রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ। এসব কারণে এ দেশের অধিকাংশ শ্রমিকের দক্ষতা কম।

বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন

১. শ্রমিকের কাজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত বেতন, ভাতা, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করতে হবে। এতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং কাজের দক্ষতা বাড়বে।

২. শ্রমিকদের কাজ করার ইচ্ছা বৃদ্ধির জন্য চাকরির স্থায়িত্ব, চাকরিতে উন্নতি, অবসর ভাতা, বিপদকালীন সাহায্য, বোনাস, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

৩. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও দক্ষ হলে শ্রমিকদের কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। সাথে সাথে তাদের দক্ষতাও বাড়বে।

৪. কলকারখানার পরিবেশ যাতে উন্নত হয় সে জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাস, সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা দরকার।

৫. শ্রমিকেরা যাতে উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল শিখতে পারে সে জন্য কলকারখানায় আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। সাথে সাথে উদ্যোক্তাগণ নব নব উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করতে পারেন।

৬. শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক শ্রম আইন প্রণয়ন করতে হবে। গঠনমূলক ও সুপরিচালিত শ্রমিক সংঘ গঠনের সুযোগ থাকতে হবে। দেশে যথাসম্ভব সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও তা বজায় রাখতে হবে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এ দেশে শ্রমের দক্ষতা বাড়বে এবং তা বিশেষ করে দেশের শিল্পোন্নয়নে সহায়ক হবে।

৩.৩.৬ জনসংখ্যা তত্ত্ব

একটি দেশে শ্রমের যোগান মূলত সে দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে। আবার দেশের জনসংখ্যার আয়তন ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ওপর নির্ভর করে কর্মক্ষম জনসংখ্যার যোগান। সম্পদের সাথে জনসংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে কর্মক্ষম জনসংখ্যা অর্থাৎ শ্রমের যোগান বাড়ে। যে তত্ত্বে দেশের সম্পদের সাথে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে জনসংখ্যা তত্ত্ব বলে। জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি ও তার কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারজনিত সমস্যা ও তার সমাধান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলোর আলোচনা স্থান পায়। জনসংখ্যা তত্ত্বগুলোর মধ্যে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বই প্রধান।

৩.৩.৭ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

১৭৯৮ সালে ইংরেজ ধর্মযাজক ও অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস তাঁর Essay on the Principle of Population as it affects the future improvement of Society নামক গ্রন্থে জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর নামানুসারে তত্ত্বটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ম্যালথাসের মতে, মানুষের অতি প্রজনন ক্ষমতার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে এবং এর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে প্রতি পঁচিশ বছরে একটি দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমির যোগান সীমিত এবং সেখানে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি দ্রুত কার্যকর হয় বলে খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যার চেয়ে অনেক ধীরে বাড়ে।

তাঁর মতে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometrical Progression), যেমন, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি গুণনের নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যার ধারায় এবং খাদ্যোৎপাদন বাড়ে গাণিতিক প্রগতিতে (Arithmetical Progression), যেমন, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি যোগের নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যার ধারায়। সুতরাং জ্যামিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধিপাপ্ত জনসংখ্যা অতি শীঘ্র গাণিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খাদ্যের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে। ফলে এমন এক সময় আসে যখন দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই অবস্থায় দেশে খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিকে অধিক জনসংখ্যার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ম্যালথাস মনে করেন, দুভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ হতে পারে : ক. প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও খ. প্রাকৃতিক নিরোধ।

বিলম্বে বিবাহ, বিবাহিত জীবনে সংযম, কৌমার্য অবলম্বন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিকে ম্যালথাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে জন্মহার কমিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। মানুষ যদি এ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে প্রকৃতি স্বয়ং দারিদ্র্য, অপুষ্টি, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়। প্রকৃতির এ ব্যবস্থাকে ম্যালথাস প্রাকৃতিক নিরোধ বলে অভিহিত করেন। এ ব্যবস্থা মৃত্যুহার বাড়িয়ে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের মধ্যে ভারসাম্য আনে। তবে প্রাকৃতিক নিরোধের দ্বারা জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে যে ভারসাম্য স্থাপিত হয় তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া প্রাকৃতিক নিরোধ কারো কাম্য হতে পারে না। সে জন্য ম্যালথাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। এ তত্ত্বের প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলো নিচে দেওয়া হল :

১. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতিতে। কিন্তু শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে মানুষের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা প্রবল হওয়ায় অনেক উন্নত দেশে জনসংখ্যা ধীরগতিতে বাড়ছে।

২. আধুনিককালে উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ফলে জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি দ্রুত প্রযোজ্য হয় না। ফলে খাদ্যোৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত বাড়ে এবং জনসংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও খাদ্যাভাব ঘটে না।

৩. ম্যালথাস জনসংখ্যাকে কেবল খাদ্যোৎপাদনের প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন, জনসংখ্যার সাথে দেশের মোট সম্পদের তুলনা করেননি। একটি দেশে খাদ্য কম উৎপাদন হলেও ঐ দেশে অন্যান্য সম্পদের বিনিময়ে খাদ্য আমদানি করে খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করতে পারে।

৪. ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির শুধু ভয়াবহ দিকটিই বিবেচনা করেছেন, ভালো দিকটি সম্পর্কে ভাবেননি। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের যোগানও বাড়ে এবং কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতির জন্য বাড়তি শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।

৫. ম্যালথাস জনসংখ্যার গুণগত দিক বাদ দিয়ে কেবল পরিমাণগত দিক বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা যদি শিক্ষিত, কর্মঠ ও উদ্যোগী হয় তবে তা দেশের জন্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে, বোঝা হিসেবে নয়।

৬. ম্যালথাসের ধারণা অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবসময়ই সমস্যা সৃষ্টি করে। আসলে তা সত্য নয়। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এড়ানো যায়।

৩.৩.৮ শ্রমবিভাগ

কোনো দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে শ্রমিকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে এক একটি অংশের কাজ এক এক জন বা এক দলের ওপর ন্যস্ত করাকে শ্রমবিভাজন বলে। যেমন, একটি আধুনিক জুতা তৈরির কারখানায় কেউ চামড়া শোধন করে, কেউ বা কাটে, কেউ জুতার সোল তৈরি করে, কেউ সেলাই করে,

কেউ পেরেক লাগায়, কেউ পালিশ করে ইত্যাদি। কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে এভাবে কাজ ভাগ করাকে শ্রমবিভাগ বলা হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হলে কোনো শ্রমিক উৎপাদিত দ্রব্যের বিশেষ একটি অংশ উৎপাদন করে মাত্র। তবে প্রত্যেকের সহযোগিতায় একটি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। শ্রমবিভাগ বিনিময়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎপাদনের উৎকর্ষতার সাথে সম্পৃক্ত।

৩.৩.৯ শ্রমবিভাগের সুবিধা

শ্রমবিভাগের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। এ সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. উৎপাদন বৃদ্ধি : শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের দামও কম হয়।

২. দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্য বৃদ্ধি : উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের ফলে এক জন শ্রমিক কোনো একটি কাজ বারবার করতে থাকে। ফলে ঐ কাজে সে ক্রমান্বয়ে দক্ষ ও নিপুণ হয়ে ওঠে।

৩. যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার : শ্রমবিভাগের দরুন এক জন শ্রমিককে সবসময় একই যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। ফলে যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়।

৪. নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার : শ্রমবিভাগের দরুন একটি বিশেষ যন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এর ফলে ঐ ধরনের যন্ত্রের ক্ষেত্রে তার পক্ষে নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।

৫. বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার : শ্রমবিভাগ যত বেশি মাত্রায় প্রবর্তিত হয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার লাভ তত সহজ হয়। শ্রমবিভাগের ফলেই আধুনিক যুগে কলকারখানায় নিত্যনতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৬. সময়ের সদ্ব্যবহার : শ্রমবিভাগের ফলে এক জন শ্রমিক একটি মাত্র কাজে নিয়োজিত থাকে। ফলে তাকে এককাজ থেকে অন্যকাজে যেতে হয় না বলে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।

৭. যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ : শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক লোক তার যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত হয়। এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে তার শক্তি ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

৮. শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি : শ্রমবিভাগ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। ফলে বিভিন্ন শিল্পে অনেকগুলো কাজের মিল দেখা যায়। ফলে একশিল্পের শ্রমিক সহজে অন্যশিল্পে কাজ পায়।

৯. কর্মসংস্থান : শ্রমবিভাগের ফলে কাজের সংখ্যা ও প্রকার বাড়ে। বৃহদায়তন কলকারখানায় নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এতে বেকারত্ব কমে।

১০. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি : শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। ফলে তার মজুরি বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৩.৩.১০ শ্রমবিভাগের অসুবিধা

শ্রমবিভাগ কোনো ত্রুটিমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা নয়। এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এর অসুবিধাগুলো নিচে বর্ণনা করা হল।

১. একঘেয়েমি সৃষ্টি : শ্রমবিভাগের ফলে এক জন শ্রমিককে সবসময় একই কাজ করতে হয়। ফলে কাজটি তার কাছে একঘেয়ে ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে।

২. সৃষ্টির আনন্দ নেই : শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক কোনো দ্রব্যের কেবলমাত্র একটি অংশ উৎপাদন করে। ফলে সে সম্পূর্ণ দ্রব্য তৈরির অপার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. সাধারণ কর্মদক্ষতা হ্রাস : শ্রমবিভাগের কারণে এক জন শ্রমিককে সবসময়ই কোনো একটি সুনির্দিষ্ট কাজ করতে হয়। ফলে ঐ কাজে তার দক্ষতা বাড়ে ঠিকই তবে সে অন্যান্য কাজের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

৪. বেকারত্বের সৃষ্টি : শ্রমবিভাগের দরুন কোনো শ্রমিক কেবলমাত্র একটি কাজ করতে শেখে। কোনো কারণে কাজটি হারালে সে অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত হতে পারে না। ফলে হঠাৎ সে বেকার হয়ে পড়ে।

৫. শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব : শ্রমবিভাগের ফলে সমাজ, শ্রমিক ও মালিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চিত ও শোষণ করতে চায়। শ্রমিকশ্রেণী টিকে থাকতে সংগ্রামে লিপ্ত হলে সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব হয়।

৬. পরিবেশ দূষণ : শ্রমবিভাগের দরুন দেশে বহু রকম কলকারখানা গড়ে ওঠে। এগুলো তাদের পরিত্যক্ত অংশ ও আবর্জনা আশপাশের এলাকায় ফেলে। তাছাড়া কারখানা এলাকায় সংকীর্ণ ও জনাকীর্ণ বস্তি গড়ে ওঠে। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

৭. মানসিক উন্নতি ব্যাহত : শ্রমবিভাগের ফলে এক জন শ্রমিক বারবার একই কাজ কিংবা একই যন্ত্র পরিচালনা করে। এর ফলে মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে, তবে এর সুবিধাই বেশি। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করে এর অসুবিধাগুলো দূর করার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত।

৩.৪.১ অর্থনীতিতে জনসংখ্যার তাৎপর্য

কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে অনেক লোক বেকার হয়ে পড়ে, দ্রব্য ও সেবার ঘাটতি দেখা দেয়, খাদ্যাভাব ঘটে। এসব সমস্যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, জনসংখ্যা দেশের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে দক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়ে, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়, মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ বাড়ে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। তাই একটি দেশের জনসংখ্যা তার সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩.৪.২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা

যে কোনো দেশের জনসংখ্যা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য জনসংখ্যার বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন ও সমাজ জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা কি ভূমিকা পালন করতে পারে তা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে এ দেশের জনসংখ্যার বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জনসংখ্যার আয়তন : বাংলাদেশ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের তিন হাজার ভাগের এক ভাগ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে এর স্থান অষ্টম। সে অর্থে, বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল দেশ।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী সে সময়ে এ দেশের জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ১৪ লক্ষ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২.০৩। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪.০৬ কোটি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১। একটি ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশে জনসংখ্যার এ বিপুল আয়তন দেশটিকে একটি অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে পরিণত করেছে। নিচে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে জনসংখ্যার আয়তনের একটি সারণি দেওয়া হল :

সারণি - ১

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা

বছর	জনসংখ্যা (কোটিতে)
১৯০১	২.৮৯
১৯১১	৩.১৬
১৯২১	৩.৩৩
১৯৩১	৩.৫৬

বছর	জনসংখ্যা (কোটিতে)
১৯৪১	৪.২০
১৯৫১	৪.৪২
১৯৬১	৫.৫২
১৯৭৪	৭.৬৪
১৯৮১	৮.৯৯
১৯৯১	১১.১৪
২০০১	১২.৯৩

উৎস : Bangladesh Population Census. 1981 1991. and 2001
বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮

স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত : ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ১০০ ঃ ১০৬.০৪। এটি শহর ও গ্রামাঞ্চলে যথাক্রমে ১০০ঃ১২৬.৩ এবং ১০০ঃ১০২.৮। নারী মৃত্যুরহার অধিক হওয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে এখানে অপেক্ষাকৃত কম। উন্নত দেশগুলোতে নারীর সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে অনেক বেশি। যেমন, জাপানে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ১০০ ঃ ৯৬.২, যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ ঃ ৯৯.৭ ও ইংল্যান্ডে ১০০ ঃ ৯৪.৩।

গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা : গ্রাম ও শহরভিত্তিক জনসংখ্যা বন্টনের চিত্র থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা যায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার বেশিরভাগই শহর এলাকায় বাস করে। যেমন, জাপানে শতকরা ৭৭ জন, ফ্রান্সে শতকরা ৭৯, ইংল্যান্ডে শতকরা ৭৮ জন শহরে বাস করে, অথচ বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোকের বসবাস গ্রামে।

শ্রমশক্তির ভিত্তিতে জনসংখ্যার বণ্টন

বাংলাদেশে জনসংখ্যার আয়তনের তুলনায় শ্রমশক্তি বেশ কম। কেননা এখানে ১৫ বছরের নিচের জনসংখ্যা প্রায় ৪৭ ভাগ। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী এ দেশের মোট শ্রমশক্তি প্রায় ৫.০৭ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ৪৫.১% ভাগ গ্রামে ও প্রায় ৫৪.৯% ভাগ শহরে কর্মরত।

জনসংখ্যার পেশাগত বণ্টন

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষি কাজে নিয়োজিত। তবে সাম্প্রতিককালে নগরায়ণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধির ফলে কৃষি খাত থেকে অকৃষিখাতে শ্রমশক্তির স্থানান্তর ঘটছে। ১৯৯১ সালে আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৩.৮ ভাগ কৃষিখাতে এবং শতকরা ২৬.২ ভাগ অকৃষিখাতে নিয়োজিত।

জন্মহার ও মৃত্যুহার : বাংলাদেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী এ দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার হাজার প্রতি যথাক্রমে ৩১.৩ জন এবং ১১.০ জন। ২০০৬ সালে জন্মহার প্রতিহাজারে ২০.৬* জন এবং মৃত্যুহার প্রতিহাজারে ৫.৬* জন। উন্নত দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের তুলনায় বাংলাদেশের এ হার দুটি অনেক বেশি। যেমন, প্রতিহাজারে জন্মহার ও মৃত্যুহার যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ জন ও ৯ জন, ইংল্যান্ডে ১৪ জন ও ১২ জন, জাপানে ১৪ জন ও ৬ জন এবং ফ্রান্সে ১৫ জন ও ১০ জন।

শিক্ষার হার : লোক গণনার এক সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে লোকের সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৮.৭ জন। শিক্ষার এ হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। যেমন, শ্রীলংকায় এ হার শতকরা ৭৩ জন, মায়ানমার (বার্মা) শতকরা ৬০ জন এবং ফ্রান্সে শতকরা ৯৯ জন।

জনসংখ্যার নির্ভরশীলতার হার : বাংলাদেশে জনসংখ্যার অধিকাংশই অন্যের ওপর নির্ভরশীল। ১৫ বছরের নিচে

* উৎস : বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক–২০০৭

এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকদের নির্ভরশীল বলা হয়। ১৯৯১-এর গণনা অনুযায়ী এ দেশের নির্ভরশীলতার হার প্রায় ৫২%। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এর হার ৩৫%, জাপানে ৩২% এবং ভারতে ৪৩%।

৩.৪.৩ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিগত কয়েক দশক ধরে উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.০৩। সম্প্রতি জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার *১.৪১ এ নেমে এসেছে। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখানো হল।

সারণি-২
বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

বছর	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)
১৯০১	০.৯০
১৯১১	০.৯৩
১৯৪১	০.৬৯
১৯৬১	২.১২
১৯৭৪	২.৭০
১৯৮১	২.৩৬
১৯৯১	২.০৩
২০০১	১.৪৮

উৎস : Bangladesh Population Census Report-1991 and 2001.

* বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক–২০০৭

সারণি-১ থেকে জানা যায়, অতীতের তুলনায় বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি। এ কারণেই যেখানে ১৯০১ সালে এ দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি ৮৯ লক্ষ, সেখানে ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ কোটি ১৪ লক্ষ এবং ২০০১ সালে দাঁড়ায় ১২.৯৩ কোটি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ করা যেতে পারে। নিচের সারণিতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখানো হল।

সারণি -৩
বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দেশ	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)
যুক্তরাষ্ট্র	০.৯২
যুক্তরাজ্য	০.২৮
ফ্রান্স	০.৩৭
গণচীন	০.৫৮
জাপান	০.০৫
রাশিয়া	−০.৩৭
ভারত	১.৪০
বাংলাদেশ	*১.৪১

উৎস : http://www.photius.com/rankings/population/population growth rate 2005 1.html

উপরের সারণি থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। উল্লেখ্য বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১ ।

৩.৪.৪ বাংলাদেশে উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। জনসংখ্যা এভাবে উচ্চ হারে বৃদ্ধির পেছনে বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হল :

ক. সামাজিক কারণ

১. শিক্ষার অভাব : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ অশিক্ষিত। এ জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন কুফল সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। ফলে তারা অধিক সন্তানের জন্ম দেয়।

২. সামাজিক কুসংস্কার : শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে জনসংখ্যা বাড়তেই থাকে।

৩. নারী স্বাধীনতার অভাব : বাংলাদেশে নারীরা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। পুরুষের ওপর নির্ভরশীল বলে সন্তান জন্মদানে তাদের ইচ্ছা প্রাধান্য পায় না। কাজেই সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

৪. চিত্তবিনোদনের অভাব : বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনসাধারণ দরিদ্র। চিত্তবিনোদনের সামান্যতম সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। বৃহৎ পরিবারের মাঝে সুখ খুঁজতে গিয়েও তারা বেশি সন্তান জন্ম দেয়।

৫. শিশু মৃত্যুর উচ্চহার : অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুরহার অনেক বেশি। এখানে প্রতিহাজারে প্রায় ৯০ জন শিশু মারা যায়। এ কারণে এ দেশে পিতামাতার জন্মদান প্রবণতা বেশি। ফলে জন্মহারও বেশি।

৬. অল্প বয়সে বিবাহ : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদেরকে ১৪-১৮ বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে দেওয়া হয়। এত কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার ফলে সন্তান জন্মদানের সুযোগ বাড়ে।

খ. অর্থনৈতিক কারণ

১. দারিদ্র্য : দারিদ্র্য ও সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা একই সাথে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জনগণ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। এ জন্য তাদের মধ্যে জন্মদানের প্রবণতা বেশি।

২. জীবনযাত্রার নিম্নমান : পুষ্টিকর খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদির অভাবে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। এখানে সন্তানের লালন পালনের ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এ জন্য অধিকাংশ লোক সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে সতর্ক নয়।

৩. কৃষিপ্রধান অর্থনীতি : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের কৃষকসমাজ কৃষিকাজের সুবিধার জন্য বেশি সন্তান কামনা করে। এ জন্য জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

৪. বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার প্রত্যাশা : বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই অধিকাংশ লোক বৃদ্ধ বয়সে সন্তান সন্ততির ওপর নির্ভর করে। নিরাপত্তা লাভের প্রত্যাশায় অনেক লোকই অধিক সন্তানের জন্মদানে আগ্রহী হয়।

৫. জন্মনিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু পদ্ধতির অভাব : বাংলাদেশের সিংহভাগ লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অনুসৃত বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য নয়। ফলে এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি।

৩.৪.৫ জনসংখ্যার ঘনত্ব

প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কত জন লোক বাস করে তাকেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। দেশের মোট জনসংখ্যাকে দেশের মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। অতএব, জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে ভূমি ও জনসংখ্যার অনুপাতকে বোঝায়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সরল সূত্রটি হল :

$$DP = \frac{TP}{TA}$$

এখানে,

DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)

TP = মোট জনসংখ্যা (Total Pouplation)

TA = দেশের মোট আয়তন (Total Area)

বাংলাদেশের বর্তমানে জনসংখ্যা ১২.৯৩ কোটি এবং আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার হওয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে নিম্নরূপ :

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{১২.৯৩ কোটি জন}}{\text{১৪৭৫৭০ বর্গ কিমি}} = \text{৮৭৬ জন (প্রতি বর্গ কিমি)}$$

দেশের মোট আয়তন স্থির থেকে লোকসংখ্যা বাড়া বা কমার ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। সাধারণভাবে কোনো দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারক বিষয়গুলো হল ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, দেশের আয়তন, জন্মহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার পদ্ধতি, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি।

৩.৪.৬ বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।

এ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তা আরো বাড়ছে। ১৯৭৪ সালে এ দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৪৯৭ জন। ১৯৮১, ১৯৯১, ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে ৬২৪ জন, ৭৫৫ জন, ৮১০ জন এবং ৮৫৪ জন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

৩.৪.৭ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল

বাংলাদেশের জনসংখ্যার আয়তন তার ভূ-ভাগের আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনেক বেশি। এতে দেশের সীমিত সম্পদের ওপর চাপ পড়ছে এবং নানা রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। নিচে বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

সামাজিক কুফল

১. নিম্ন জীবনযাত্রার মান : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক দরিদ্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এদের মধ্যেই বেশি। দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশুদ্ধ পানি, সুচিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির অভাব দিন দিন বাড়ছে। ফলে জীবনযাত্রার মানের আরো অবনতি ঘটছে।

২. পুষ্টিহীনতা : জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ার ফলে জনসাধারণের, বিশেষ করে, শিশুদের জন্য দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী প্রয়োজনমাফিক সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশে পুষ্টিহীনতার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বর্তমানে শতকরা ৮০ ভাগ শিশু অপুষ্টির শিকার।

৩. আবাসিক সমস্যা : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশে, বিশেষ করে, শহরাঞ্চলে প্রকট আবাসিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বাড়তি জনসাধারণের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে চাষযোগ্য জমিও কমে যাচ্ছে।

৪. মানব সম্পদের উন্নয়নে বাধা : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন বাড়তি জনসাধারণের ভরণ পোষণের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি শিক্ষা তথা মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫. **পরিবেশ দূষণ :** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটছে। জনসংখ্যা অত্যধিক বাড়ার কারণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের অপ্রতুলতা, ময়লা ও পানি নিষ্কাশনের অব্যবস্থা, অনিয়ন্ত্রিতভাবে কলকারখানা স্থাপন, ব্যাপক হারে বৃক্ষ কর্তন প্রভৃতি ঘটছে। এসব এ দেশের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত ও জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তুলছে।

অর্থনৈতিক কুফল

১. বেকারত্ব বৃদ্ধি : বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের গতি মন্থর। কৃষির ওপরও রয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ। এ অবস্থায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে দেশে কর্মক্ষম লোকদের মধ্যে প্রায় ২.২ মিলিয়ন বেকার।

২. খাদ্য ঘাটতি : জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে গত তিন দশক ধরে প্রতিবছরই দেশে বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে। এ ঘাটতি পূরণের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। ফলে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির আমদানি বিঘ্নিত হয়। এসব কারণে আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৩. দ্রব্য ও সেবার দাম বৃদ্ধি : বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়ছে না। এতে চাহিদার তুলনায় এগুলোর যোগান কম। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ অনেকগুলো দ্রব্য ও সেবার দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে এসেছে।

৪. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অতিনির্ভরতা : অধিক জনসংখ্যার ভরণ পোষণের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশ দরিদ্র বলে এ সম্পদের যোগান দিতে পারে না। বাধ্য হয়েই আমাদেরকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ নির্ভরশীলতা আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথে অন্তরায়।

৫. জমির উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নতা : শিল্পোন্নয়নের অভাবে বাংলাদেশে কৃষি বহির্ভূত খাতে কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি জনসংখ্যাকে বাধ্য হয়ে কৃষির ওপরই নির্ভর করতে হয়। ফলে কৃষি জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং সেগুলো ক্রমে উপবিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র হয়ে পড়ছে।

৬. পুঁজি গঠনের সমস্যা : বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। স্বল্প সঞ্চয়ের জন্য দেশে পুঁজি গঠনের হারও কম।

৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যা : বিপুল জনসংখ্যার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমদানি ব্যয় ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের মন্থর গতির জন্য রপ্তানি তেমন বাড়ছে না। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

৮. উন্নয়নের সুফল নষ্ট : দেশে উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত বাড়তি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রমশ বেশি সংখ্যক লোকের মধ্যে ভাগ হচ্ছে। উন্নয়ন সত্ত্বেও জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ছে না। এ জন্য আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত ।

৩.৪.৮ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার আয়তন এবং এর বৃদ্ধির হার অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে । এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাই এ সমস্যার সমাধান একান্তভাবে কাম্য। এ দেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করা হল :

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৃষি ও শিল্প খাতে দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অধিক পরিমাণ সেবাকর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুকূলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমবে।

২. শিক্ষার প্রসার : শিক্ষিত লোকজন জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্পর্কে বেশি সজাগ। দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাই অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটলে তারা নিজেদের স্বার্থে পরিবারের আয়তন ছোট রাখতে সচেষ্ট হবে।

৩. নারী শিক্ষার প্রসার : বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। নারী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে নারী সমাজকে জন্মরোধের আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি সফলতা লাভ করবে।

৪. সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন : বাংলাদেশে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিদ্যমান। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, অথচ অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত দরিদ্র। দেশে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে সবার আয় বাড়বে। এতে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জনসাধারণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

৫. বহুমুখী কর্মসংস্থান : বাংলাদেশের বেকার নারী পুরুষের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে কুটির শিল্প স্থাপন, হাঁস মুরগি পালন, পশু পালন, মৎস্য চাষ, নার্সারী, ফলের বাগান, পোশাকশিল্প স্থাপন ইত্যাদি বহুমুখী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তারা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত লোকরা ছোট পরিবার গড়ে তুললে জনসংখ্যার চাপ কমবে।

৬. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন : বাংলাদেশের সকল জেলায় জনঘনত্ব সমান নয়। ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি, অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান ইত্যাদি জেলায় জনঘনত্ব অনেক কম। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে জনবিরল এলাকায় জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন করলে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা লাঘব হবে।

৭. আন্তর্জাতিক স্থানান্তর : পৃথিবীর অনেক দেশেই জনসংখ্যা বেশ কম। যেসব দেশে জনসংখ্যা কম সেগুলাতে বাংলাদেশ থেকে উদ্বৃত্ত জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে জনাধিক্যের সমস্যা লাঘব করা যায়। ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. আইন প্রণয়ন : আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ এবং গর্ভপাত অনুমোদন করা সম্ভব হলে জন্মহার হ্রাস পাবে। তাছাড়া বিয়ের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি ও তা বলবৎ করাও প্রয়োজন। ব্যাপক প্রচার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইনের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. পরিবার পরিকল্পনা : সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর, ছোট পরিবার গড়ে তুলতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ওষুধ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ দেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জনপ্রিয় ও সফল করে তোলা যায়।

৩.৪.৯ পরিবার পরিকল্পনা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিবারের আয়তন সীমিত বা ছোট রাখার পরিকল্পিত প্রচেষ্টাকে পরিবার পরিকল্পনা বলা হয়। পরিবারের ছেলেমেয়ের সংখ্যা যদি কম এবং পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সে পরিবার সচ্ছল ও সুখী হবে। তাই পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক সন্তানের জন্মদান করা উচিত যাতে সে পরিবার সচ্ছল ও সুখী জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হলে সমগ্র দেশের জনসংখ্যাও কম হবে।

৩.৪.১০ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব

জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশে নানা রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিচে এ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হল :

পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা হলে এ দেশে খাদ্য ঘাটতি ও বেকারত্ব কমে যাবে। কৃষি জমির ওপর অধিক জনসংখ্যার চাপ কমার ফলে কৃষি জমির খণ্ডিকরণ কমবে এবং উৎপাদন বাড়বে। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা কম রাখা সম্ভব হলে আমাদের মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় বাড়বে। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং মূলধন গঠন বাড়বে। জনসংখ্যা কম হলে সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। বেশি সংখ্যক লোক শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা পাবে। সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায়, পরিবার পরিকল্পনা এ দেশে উচ্চ জন্মহার রোধ করে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথও সুগম হবে। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সবরকম বাধা দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

৩.৪.১১ আদমশুমারি

কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণত ১০ বছর অন্তর দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক জানার জন্য জরিপ পরিচালনা করা হয়। একেই আদমশুমারি বলে। জনসংখ্যার আয়তন, বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যার ঘনত্ব, স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা ও অনুপাত, গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যার বন্টন, জন্মহার, মৃত্যুহার, আয়ুষ্কাল, শিশু মৃত্যুরহার, নির্ভরশীলতার হার, সাক্ষরতার হার ইত্যাদি পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট ছকে সংগ্রহ করা হয়। এ কাজ করার জন্য আগেই বেশ কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব লোককে গণনাকারী বলে। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংখ্যার ওপর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্য সংগৃহীত হওয়ার পর সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে প্রথমে জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন বা খণ্ড রিপোর্ট ও পরে জাতীয়ভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) আদমশুমারি পরিচালনা করে। এ কাজে এক দল বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি থাকে। এ কমিটি সার্বিক আদমশুমারির কাজ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করে।

আদমশুমারির প্রয়োজনীয়তা : কোনো দেশের আদমশুমারির রিপোর্ট সে দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদান করে। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আদমশুমারির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনসংখ্যা সম্পর্কে এমন সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। নিচে আদমশুমারির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

১. আদমশুমারির রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা যায়, দেশের জনসংখ্যার আয়তন কত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের সম্পদ বৃদ্ধির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দেখে আরো বলা যায়, জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ছে কিনা।

২. মৃত্যুহার দেখে দেশে খাদ্য ও চিকিৎসা সুবিধা সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়। মৃত্যুহার অধিক হলে বোঝা যাবে জনসাধারণ অপুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবের শিকার।

৩. জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট দেশটি জনবহুল না জনবিরল। জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হলে বুঝতে হবে দেশটিতে আবাসিক সমস্যা বর্তমান, সাথে রয়েছে পরিবেশগত দূষণ।

৪. গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যার বন্টন দেখে বলা যায়, দেশটি গ্রামপ্রধান না নগরপ্রধান। তাছাড়া, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে শহুরে লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে বুঝতে হবে দেশে নগরায়ণের মাত্রা বাড়ছে।

৫. আদমশুমারি থেকে জনসংখ্যার বয়স কাঠামো সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তা থেকে কর্মক্ষম জনশক্তি এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ জানা যায়।

৬. জনগণের পেশাগত বণ্টনের ভিত্তিতে বলা যায়, কৃষি না শিল্পে বেশি লোক নিয়োজিত। বেশি লোক কৃষি কাজে জড়িত হলে দেশটি হবে কৃষিপ্রধান, যেমন, বাংলাদেশ। আর বেশি লোক শিল্পে নিয়োজিত হলে বুঝতে হবে দেশটি শিল্পপ্রধান, যেমন, ইংল্যান্ড। এভাবে আদমশুমারির রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক জানা যায়। বস্তুত যে কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আদমশুমারির রিপোর্ট সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়।

৩.৫.১ মূলধন

সাধারণ অর্থে ব্যবসায়ে নিয়োজিত টাকা পয়সাকে মূলধন বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে। প্রকৃতি প্রদত্ত কয়লা, লোহা ও মানুষের শ্রমে যে লাঙল তৈরি হয় তা কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই লাঙল হল মূলধন। অর্থনীতিবিদ বম বাওয়ার্ক-এর মতে, "মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।"[৫] "অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যেসব দ্রব্য মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। এ অর্থে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচামাল, গুদামঘর প্রভৃতি মূলধন।

৩.৫.২ সঞ্চয়

সাধারণত সঞ্চয় বলতে টাকা পয়সা জমা করাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এর ভিন্নতর অর্থ রয়েছে। আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। যেমন, কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় ২,০০০ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ১,৫০০ টাকা হলে তার মাসিক সঞ্চয় ৫০০ টাকা। আয় ও ভোগ পরস্পর সমান হলে সঞ্চয় করা যায় না। যদি $Y =$ আয়, $C =$ ভোগ এবং $S =$ সঞ্চয় হয়, তাহলে গাণিতিক সূত্রে লেখা যায় $S = Y - C$।

৩.৫.৩ বিনিয়োগ

সাধারণ অর্থে ব্যবসায় বাণিজ্যে অর্থ ব্যয় করাকে বিনিয়োগ বলে। তবে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ শব্দটির বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মজুদ মূলধন দ্রব্যের সঙ্গে যতটা অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য যোগ করা হয় তাকেই অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগ হচ্ছে কলকব্জা, দালানকোঠা, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও মজুদ মাল ইত্যাদি মূলধন দ্রব্যের বৃদ্ধি। অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনসের মতে, "আগে থেকেই আছে এমন মূলধন দ্রব্যসামগ্রীর সাথে যে অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য সংযোজিত হয় তাকেই বিনিয়োগ বলে।" যেমন, ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কারখানায় ১ লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেখানে আরো ২০ হাজার টাকার মূলধন দ্রব্য যোগ করা হলে ঐ নতুন সংযোজনকে বিনিয়োগ বলে।

৩.৫.৪ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক

ভোগ ব্যয়ের পরে আয়ের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে সঞ্চয় বলে। সঞ্চয় হল আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য। আর সঞ্চয়কে উৎপাদনে খাটিয়ে বর্তমান মূলধন দ্রব্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা নতুন মূলধন সৃষ্টি করা হলে তাকে বিনিয়োগ বলা হয়। বস্তুত সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি। এ কারণে বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। সঞ্চিত অর্থ মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয় করলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে। তাই সঞ্চয় হল বিনিয়োগের ভিত্তি এবং ফলপ্রসূ বিনিয়োগ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

৩.৫.৫ মূলধনের কার্যাবলি

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা মূলধন নির্ভর। এ উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে। মূলধনের কার্যাবলি নিচে বর্ণনা করা হল :

১. উৎপাদন বৃদ্ধি : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধন দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এগুলো উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায়। এ কারণেই বৃহদায়তন শিল্পে ও যন্ত্রায়িত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বেশি।

২. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি : উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হলে শ্রমিকদের দৈহিক পরিশ্রম লাঘব হয়। ফলে তারা নিজ নিজ কাজ অধিক যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে পারে। ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

---

৫. "Capital is the produced means of production." Bohm-Bawerk

৩. উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ : যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কাঁচামাল, দালানকোঠা ইত্যাদি মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে এগুলোর পরিমাণ বাড়ালে উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে।

৪. শ্রমবিভাগ প্রবর্তন : শ্রমবিভাগ আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। উৎপাদন ক্ষেত্রে অনেকগুলো মূলধনী দ্রব্য ব্যবহার করলেই কেবল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়।

৫. উৎপাদনের সময় সংক্ষেপ : উৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা ব্যবহারের ফলে কম সময়ে বেশি কাজ করা সম্ভব হয়। এতে উৎপাদনের জন্য কম সময় ব্যয় হয় এবং শ্রমিকদের অবসর বাড়ে।

৬. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : মূলধনী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়। এর ফলে কারখানায় অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচজনিত বেশ কিছু সুবিধা দেখা দেয়। তাতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর দামও কম হয়।

৭. বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব : বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে ও উৎপাদিত পণ্য গুণে ও মানে সমৃদ্ধ হয়। তবে উৎকৃষ্ট ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারাই বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব।

৮. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : দেশে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। মূলধনের পরিমাণ যত বাড়ে দেশে তত নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠে। ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে এবং বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়।

৯. উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা : উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। ফলে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে এবং ভোক্তাকে দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

১০. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন : দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। এ কাজে মূলধন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের চাহিদা ক্রমশ বাড়ে।

মূলধনের এসব কাজের ফলেই কম খরচে, গুণে ও মানে উন্নত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব।

৩.৫.৬ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত মূলধনের ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ বাড়ে এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। নিচে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হল :

১. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূলধনের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কারণ, একমাত্র মূলধনের বহুল ব্যবহার দ্বারাই দেশের সকল খনিজ, বনজ, জলজ সম্পদ আবিষ্কার, উত্তোলন ও ব্যবহার সম্ভব হয়।

২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গঠন : যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, বন্দর, বিদ্যুৎ শক্তি, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদিকে সামাজিক বুনিয়াদ বলে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গঠন করা প্রয়োজন। এ কাজে মূলধনের ব্যবহার অপরিহার্য।

৩. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি : উৎপাদন ক্ষেত্রে বেশি ও উন্নতমানের মূলধন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। দক্ষ শ্রমিক বেশি উৎপাদন করতে পারে। অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক।

৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টি : দেশে বেশি করে মূলধন গঠিত হলে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে অনেকের কর্মসংস্থান হয়।

৫. কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণ : উন্নত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও কলাকৌশলের ব্যবহার উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধনী দ্রব্য ব্যবহার করলে তাদের আধুনিকীকরণ ঘটে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

৬. কম খরচে বেশি দ্রব্য উৎপাদন : উৎপাদন ক্ষেত্রে অধিক মূলধন ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তনে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের নানা সুবিধার কারণে গড় খরচ কমে আসে। সুতরাং অধিক মূলধনের ব্যবহার দ্বারা কম খরচে বেশি দ্রব্য উৎপাদন করা যায়।

৭. নতুন যন্ত্র ও উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার : উৎপাদন ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে মূলধন ব্যবহৃত হলে ব্যয়বহুল ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায়। শ্রমিক এসব যন্ত্রপাতির ওপর বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করতে পারে।

৮. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : উৎপাদনে অধিক মূলধন ব্যবহৃত হলে শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এতে তাদের মজুরিও বাড়ে। বেশি মজুরি দিয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগের ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

উপরের বিবরণের আলোকে বলা যায়, কোনো দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব অনেক বেশি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের স্বল্পতার জন্যই উন্নয়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। তাই একমাত্র উচ্চহারে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের দ্বারাই এসব দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

৩.৫.৭ মূলধন গঠন

কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃত মূলধন দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধিকে মূলধন গঠন বা মূলধন সৃষ্টি বলে। অন্য কথায়, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা সামগ্রী, বিদ্যুৎ পরিবহন দ্রব্য, রাস্তাঘাট, বাঁধ প্রভৃতি মূলধন দ্রব্য বেশি পরিমাণে তৈরি করাকে মূলধন গঠন বলে। দেশের মানুষের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করলে মূলধন সৃষ্টি হয়। তাই যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে তার বিনিয়োগ ঘটে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলে এবং যে পরিমাণ মূলধন দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাই হল গঠিত মূলধনের পরিমাণ।

মনে করা যাক, ১৯৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৫,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। কিন্তু পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের জুন মাসে দেশের মোট মূলধনের মূল্য দাঁড়ালো ৫,৫০০ কোটি টাকা। তাহলে ১ বছরে অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ হল ৫,৫০০-৫,০০০ কোটি টাকা। সুতরাং এক্ষেত্রে বার্ষিক মূলধন গঠনের পরিমাণ হল ৫০০ কোটি টাকা।

৩.৫.৮ মূলধন গঠন **কীভাবে হয়**

মূলধন গঠন প্রাথমিকভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগ করলে মূলধন গঠিত হয়। একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্ত যথা ১. আর্থিক সঞ্চয়ের সৃষ্টি, ২. আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও ৩. আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি : মূলধন গঠন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে সঞ্চয় সৃষ্টি। পুঁজিবাদী ও মিশ্র পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয় নির্ভর করে তার সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর।

অ. সঞ্চয়ের সামর্থ্য : মূলত আয়ের ওপরই মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয়ের পরিমাণ বেশি হলে সাধারণত সঞ্চয় বেশি হয়। এ ছাড়া পরিবারের আয়তন ছোট হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য বাড়ে।

আ. সঞ্চয়ের ইচ্ছা : ব্যক্তিগত সঞ্চয়,সঞ্চয়ের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপরও নির্ভরশীল। কোনো দেশে মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ক. দূরদৃষ্টি : ভবিষ্যতে পরিবারের ভরণ পোষণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ দেখা যায়।

খ. পারিবারিক স্নেহমমতা : পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক স্নেহশীল ব্যক্তিরা পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়।

গ. উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা : সঞ্চয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনার সাথে সাথে সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়ায়। তাই মানুষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লোভে বেশি করে সঞ্চয় করে।

ঘ. কার্পণ্য : কৃপণ ব্যক্তিরা অভ্যাসবশত সবসময়ই ভোগ কমিয়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

ঙ. জানমালের নিরাপত্তা : দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও আইন কানুন বজায় থাকলে জানমালের নিরাপত্তা থাকে। তখন মানুষ বর্তমান ভোগ ত্যাগ করে ভবিষ্যতে বেশি ভোগের আশায় সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়।

চ. সুদের হার : সুদের হার সঞ্চয়কারীদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চহারে সুদ প্রদান করলে জনসাধারণের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়ে।

ছ. কর ব্যবস্থা : সরকারের করনীতিও জনসাধারণের সঞ্চয় অভ্যাসকে প্রভাবিত করে। করহার বেশি হলে লোক কম সঞ্চয় করে।

জ. শিক্ষার হার : দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনসাধারণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হয়। এতে তাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা বাড়ে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়াও দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঞ্চয়, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ, রাজস্ব উদ্বৃত্ত, সরকারি ঋণ গ্রহণ, বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি একটি দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

২. আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ : মূলধন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তা যোগান দেওয়া দরকার। কারণ কেবল সঞ্চয় হলেই মূলধন গঠিত হয় না। মূলধন গঠিত হতে হলে সঞ্চয়সমূহকে সংগ্রহ করতে হয়। দেশে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অলস আর্থিক সঞ্চয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়।

৩. আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধন দ্রব্যে রূপান্তর : মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সংগৃহীত সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন দ্রব্যে রূপান্তর করা প্রয়োজন। সংগৃহীত সঞ্চিত অর্থ ঠিকভাবে মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করতে পারলে তবেই দেশে মূলধন গঠিত হয়। অবশ্য এ জন্য দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উপরিউক্ত পদ্ধতিতে মূলধন গঠিত হয় এবং এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩.৫.৯ বাংলাদেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন গঠন প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে মূলধন গঠনের হার অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। এ দেশে মূলধন গঠনের পথে নিম্নবর্ণিত সমস্যা বা বাধাসমূহ রয়েছে :

১. স্বল্প মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য : মূলধন গঠনের প্রধান উপাদান হল সঞ্চয় বৃদ্ধি। সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আয়। কিন্তু বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় খুব কম। বর্তমানে তা প্রায় ৫২০ মার্কিন ডলার। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ জনগণের গড় মাথাপিছু আয় তার অর্ধেক।এ রকম স্বল্প আয় ও ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্য এ দেশের সঞ্চয়ের হার খুব কম। সুতরাং আমাদের দেশে মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা হল স্বল্প আয় ও স্বল্প সঞ্চয়।

২. সঞ্চয়ের ইচ্ছার অভাব : আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম, আবার ইচ্ছাও কম। দূরদৃষ্টি ও শিক্ষার অভাব, সুদের স্বল্প হার, কর ব্যবস্থা এবং অদৃষ্টবাদী মনোভাবের কারণে এ দেশের জনসাধারণের সঞ্চয় প্রবণতা কম। বরং তারা তাদের স্বল্প উদ্বৃত্ত অর্থ জমি বা অলংকার ক্রয় এবং অন্যান্য অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করে। ফলে প্রকৃত বিনিয়োগ কম হয়।

৩. সঞ্চয় সংগ্রহের অসুবিধা : আমাদের দেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয় রয়েছে তা ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগ করা যায় না। কেননা এদেশের গ্রামে গঞ্জে এখনো পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যাংকের শাখা নেই। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকের টাকা রাখার অভ্যাসও গড়ে ওঠেনি। সঞ্চয় সংগ্রহের অসুবিধার জন্য এ দেশে বিনিয়োগ কম এবং এ জন্য মূলধন গঠন কম।

৪. দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব : সঞ্চিত অর্থ কলকারখানায় বিনিয়োগ করলে মূলধন দ্রব্য তৈরি হয়। সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগের জন্য দক্ষ উদ্যোক্তা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশে দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

৫. কারিগরি জ্ঞানের অভাব : বাংলাদেশে শ্রমিকদের আধুনিক ও উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এ দেশের উৎপাদনের কলা কৌশলও পুরাতন। এ কারণে এখানে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

৬. বিনিয়োগের স্বল্পতা : বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিনিয়োগ কম হলে কলকারখানায় উৎপাদন কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হারও কম হয়ে থাকে।

৭. প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ : মূলধন গঠনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশে অব্যাহত বিনিয়োগ চালু রাখা দরকার। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে। এ জন্য কলকারখানায় বিনিয়োগ বিঘ্নিত হয়। ফলে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

এ ছাড়াও বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বল্পতা, সম্পদের অপচয় এবং অনুন্নত অবকাঠামো ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে মূলধন বাধাগ্রস্ত হয়।

৩.৫.১০ সংগঠন

কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রিত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকিবহন প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পাদন করাকেই সংগঠন বলে। অর্থনীতিবিদ হ্যানি বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপকরণসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলা হয়।"[৬] সংগঠন উৎপাদনের এমন একটি সক্রিয় উপকরণ যা উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্যান্য উপকরণকে ক্রিয়াশীল ও উৎপাদক্ষম করে তোলে।

৩.৫.১১ সংগঠক

উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাঁকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রিত করেন, এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদনের যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কারবারের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি উদ্যোক্তাকেই বহন করতে হয়। কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা একদিকে তার মালিক এবং অন্যদিকে তার সংগঠক ও ঝুঁকিগ্রহণকারী। উৎপাদনের এ গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য উদ্যোক্তাকে কর্মাধ্যক্ষ বলা হয়। অর্থনীতিবিদ মার্শাল উদ্যোক্তাকে শিল্পাধিনায়ক' "Captain of the industry" বলে অভিহিত করেছেন।

---

৬. "Organisation is a harmonious adjustment of specialized parts for the accomplishment of some common purpose or purposes." Haney

৩.৫.১২ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংগঠকের ভূমিকা

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংগঠক বা উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এরূপ উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সংগঠকের ভূমিকা অপরিসীম।

নিচে আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংগঠকের ভূমিকা বর্ণনা করা হল :

১. কারবার গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন : সংগঠকই কোনো কারবার গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কারবারের সাফল্যের সম্ভাবনা পরীক্ষা, তা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রণয়ন, প্রাথমিক খরচসমূহ নির্বাহের জন্য মূলধনের সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সংগঠককেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

২. উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ : সংগঠককে উৎপাদিত দ্রব্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোনো দ্রব্য কী পরিমাণে ও কী পদ্ধতিতে উৎপাদিত হবে, কোথায় উৎপাদিত হবে, উৎপাদিত দ্রব্যের মান কি হবে, কত দামে তা বিক্রয় হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে সংগঠক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করেন।

৩. উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা : উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রত্যেক বিভাগের কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রমিকদেরকে উপযুক্ত জায়গায় নিয়োগ, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মেশিন চালু রাখা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাজ সংগঠক সম্পন্ন করেন। এসব কাজের পরই উৎপাদন সম্ভব হয়।

৪. উপকরণসমূহের পারিশ্রমিক প্রদান : সংগঠক বা উদ্যোক্তা উৎপাদনে নিযুক্ত ভূমি, শ্রম ও মূলধনের পারিশ্রমিক প্রদান করেন। উৎপাদন চলাকালেই তিনি চুক্তি অনুযায়ী ভূমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদ পরিশোধ করেন।

৫. ঝুঁকি বহন : উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা কারবারের ঝুঁকি নেওয়া সংগঠকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। পূর্বানুমানের ভিত্তিতে সংগঠক কোনো দ্রব্য উৎপাদন করেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ করে কমে যেতে পারে। এ অবস্থায় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা সংগঠককেই বহন করতে হয়।

৬. উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুনত্ব প্রবর্তন : মুনাফা বাড়ানোর জন্য সংগঠককে উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন পনথা ও কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রবর্তন করতে হয়। ব্যবসায়ে টিকে থাকতে হলে নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদন, কাঁচামালের নতুন উৎসের অনুসন্ধান এবং দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করতে হয়।

৭. উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা : কেবল উৎপাদনই নয়, বরং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করাও সংগঠকের অন্যতম প্রধান কাজ। সুষ্ঠুভাবে দ্রব্যের বাজারজাতকরণের জন্য ভোক্তার চাহিদা প্রবণতা পর্যবেক্ষণ, দ্রব্যের গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হতে হয়।

৮. মুনাফা আহরণ : সংগঠকের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। উদ্যোগ গ্রহণ, উৎপাদন কাজ পরিচালনা এবং উৎপাদনের সব ঝুঁকি বহনের পারিতোষিক হিসেবে সংগঠক এ মুনাফা অর্জনের অধিকারী হন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উৎপাদনের সকল ব্যয় মেটানোর পর তিনি এ মুনাফা পান।

৩.৫.১৩ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান : যেসব প্রতিষ্ঠানে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন অথবা ক্রয়বিক্রয় হয় সেগুলোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা করবার বলে। যেমন, ছোটবড় সবরকম শিল্প কারখানা, অন্যান্য উৎপাদনশীল ক্ষেত্র, দোকানপাটসহ সবরকম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সাধারণভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কারবার সংগঠন বলা হয়।

অতীতে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রূপ ছিল সহজ সরল ও অপেক্ষাকৃত ছোট। সে সময় প্রধানত এক

মালিকানা কারবারই বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক বেশি জটিল এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেক ব্যাপক। তাই বর্তমানকালে বিশ্বের প্রতিটি দেশে নানা ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ : মালিকানা ও পরিচালনার ভিত্তিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) এক মালিকানা কারবার, (২) অংশীদারী কারবার, (৩) যৌথ মূলধনী কারবার, (৪) সমবায় কারবার ও (৫) রাষ্ট্রীয় কারবার। নিচে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ এর বিবরণ দেওয়া হল :

১. এক মালিকানা কারবার : ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ হল এক মালিকানা কারবার। যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক জন মাত্র মালিক থাকে এবং সে নিজে একক উদ্যোগে পুঁজি সংগ্রহ ও ঝুঁকি বহনসহ ব্যবসায়ের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে তাকে এক মালিকানা কারবার বলে। এ ধরনের ব্যবসায়ে মালিক একাই লাভ ক্ষতির ভাগী হন বলে কারবারে তার দায়-দায়িত্ব অসীম। কারবারে শ্রমিক কর্মচারি নিয়োগ করা হলেও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও দায়দায়িত্ব মালিকের ওপরই এককভাবে বর্তায়। সাধারণত মাঝারি ও ছোট আকারের কারবার এক মালিকানা ভিত্তিক হয়ে থাকে।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের প্রধান কয়েকটি সুবিধা হল সহজ গঠন পদ্ধতি, স্বল্প পুঁজি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবসায়ের নমনীয়তা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গোপনীয়তা রক্ষা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, এ রকম ব্যবসায়ের কিছু অসুবিধাও থাকে। সেগুলো হল সীমিত আয়তন, অসীম দায়, অপ্রতুল তত্ত্বাবধান, একক ঝুঁকি, ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা, শ্রমবিভাগের অভাব ইত্যাদি। এক মালিকানা কারবারের কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে অধিকাংশ লোকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য।

২. অংশীদারী কারবার : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক সাথে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে অংশীদারী কারবার বলা হয়। অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব, কারবারের অর্থ সংগ্রহ, লাভ লোকসান, নতুন অংশীদার গ্রহণের শর্ত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো চুক্তিতে উল্লেখ থাকে। এ কারবারে কমপক্ষে ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ অংশীদার থাকতে পারে। দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব অসীম। অংশীদাররা সম্মিলিতভাবে অথবা সব সদস্যের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য এ কারবার পরিচালনা করতে পারে।

অংশীদারী কারবারের উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো হল বেশি পুঁজি সংগ্রহ, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, ঝুঁকি বণ্টন, যৌথ সিদ্ধান্ত, শ্রমবিভাগ প্রবর্তন, ঋণের সুবিধা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে এরূপ কারবারের প্রধান প্রধান অসুবিধা হল প্রত্যেক অংশীদারের অসীম দায়িত্ব, মতানৈক্য, ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে অনীহা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, পৃথক হওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি।

৩. যৌথ মূলধনী কারবার : বেশি সংখ্যক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো কারবার গড়ে তুললে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে। প্রথমে কয়েকজন ব্যক্তি যৌথ মূলধনী কারবার গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সেখানে কারবারের নাম, উদ্দেশ্য, পুঁজির পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। সরকারের অনুমোদনের পর এটি একটি আইনসজ্ঞাত পৃথক প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে। এরপর জনসাধারণ ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে এ কারবারের শেয়ার বিক্রি করে ব্যবসায়ের পুঁজি সংগ্রহ করা হয়। যাঁরা শেয়ার ক্রয় করেন তারা এ কারবারের অংশীদার বা মালিক হয়ে যান। এ কারবারে বহু সংখ্যক অংশীদার থাকায় এর পরিচালনার ভার পরিচালকমন্ডলীর ওপর ন্যস্ত থাকে। এ কারবারের প্রত্যেক অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ। কারবারের লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এরূপ কারবার প্রয়োজনে দেশের মধ্যে ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ঋণ গ্রহণ করে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে।

যৌথ মূলধনী কারবার আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রায় সব বড় বড় উৎপাদন কর্ম বা ব্যবসায় যৌথ মূলধনী কারবারের মাধ্যমে চলে। এ কারবারের প্রধান প্রধান সুবিধা হল বৃহদায়তন উৎপাদন, অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রসারের সুযোগ, ঝুঁকি বণ্টন, উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যাপক শ্রমবিভাগের সুবিধা প্রভৃতি। এ ছাড়া এ ধরনের বড় ও আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের আস্থা অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যৌথ মূলধনী কারবারের কিছু কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। সেগুলো হল কারবার গঠনের জটিলতা, কারবার পরিচালনায় ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সম্ভাবনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিলতা, বিলম্বের আশংকা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটার আশংকা ইত্যাদি।

কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু সরকারি নীতি গ্রহণ করা হলে এরূপ কারবারের অসুবিধা অনেকাংশে দূর করা যায়। বস্তুত, আধুনিককালে এ ধরনের বৃহদাকার কারবার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশি প্রয়োজন।

৪. সমবায় কারবার : কিছুসংখ্যক বিত্তহীন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমান অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তাকে সমবায় কারবার বলা হয়। সমবায়ের মূলমন্ত্র- একতা, শৃংখলা ও সততা। পারস্পরিক সহযোগিতা এরূপ কারবারের মূল ভিত্তি। এ কারবারের সদস্যগণ নিজেরাই ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজি সরবরাহ এবং কারবার পরিচালনা ও তার যাবতীয় ঝুঁকি বহন করেন। সদস্যগণ কারবারের মালিক হওয়ায় এর মুনাফাও অংশীদারিত্বের অনুপাতে ভোগ করেন। কৃষি খামার, কুটির শিল্প, ভোগ্যপণ্যের দোকান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় কারবার দেখা যায়।

সমবায় ভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত ছোট আকারের হয়ে থাকে। এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো হল মধ্যস্বত্বভোগি এবং শ্রমিক সমস্যার অনুপস্থিতি, স্বল্প দামে দ্রব্য সরবরাহ, নিম্নবিত্ত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি, নৈতিক চেতনার উন্মেষ, মিতব্যয়ী ও স্বনির্ভর দৃষ্টভঙ্গির বিকাশ প্রভৃতি। পাশাপাশি সমবায় কারবারের কিছু সমস্যাও লক্ষ করা যায়। এগুলো হল সমবায় নীতিমালা না মেনে চলা, পুঁজির স্বল্পতা, মতানৈক্য, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রেরণার অভাব প্রভৃতি।

বাংলাদেশের মতো স্বল্প পুঁজির দেশে সমবায় কারবারের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সমবায়ের শিক্ষা ও চেতনার অভাবে এ দেশে সমবায় কারবারের প্রসার ঘটছে না। বরং কৃষি ও অন্যান্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্রে যে সমবায় ব্যবসায় চালু ছিল, তা বিভিন্ন কারণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ দেশে সমবায় ভিত্তিক কারবারের প্রসার ঘটাতে হলে সমবায় আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার অপরিহার্য।

৫. রাষ্ট্রীয় কারবার : যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরাসরি সরকার কর্তৃক গঠিত হয় অথবা জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয় সেগুলোকে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় কারবার বলা হয়। এসব কারবার সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সাধারণত যেসব কারবার জনসাধারণের কল্যাণ এবং দেশে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন, সেসব প্রতিষ্ঠান সরকার নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। কেননা এসব কারবার বেসরকারি খাতে থাকলে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বাংলাদেশে রেলপথ, ডাক ও তার, টেলিভিশন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরকারি বা রাষ্ট্রীয় কারবার।

আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কারবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এ রকম কারবারের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে। যেমন, এ ধরনের রাষ্ট্রীয় কারবার পর্যাপ্ত পুঁজি সংগ্রহ এবং জনসাধারণকে ন্যায্য দামে দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করতে পারে। দেশে ভারি ও মৌলিক শিল্প এ ধরনের কারবারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সরকারি কারবার সাধারণত বড় আকারের হয় বলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে। এ রকম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রীয় কারবারের সুবিধার পাশাপাশি কিছু কিছু অসুবিধাও থাকে। সরকার কর্তৃক শিল্পকারখানা স্থাপন করা হলে দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। এ রকম কারবারে অনেকসময় আমলাতান্ত্রিক বিধি বিধানের ফলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি স্থান পায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শ্রমিক ও কর্মচারি নিয়োজিত থাকায় কারবারের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তা অলাভজনক হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় কারবার কোনো কোনো সময়ে প্রতিযোগিতার অভাবে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়ে এবং মান কমে যায়। ফলে ক্রেতাদের স্বার্থহানি ঘটে।

রাষ্ট্রীয় কারবারের ত্রুটিগুলো দূর করা হলে তা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় এ কারবার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অনেক কলকারখানাও সরকারি উদ্যোগে ও মালিকানায় পরিচালিত হয়। দেশের শিল্পের উন্নয়ন তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এরূপ সরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ত্রুটিমুক্ত, দক্ষ ও লাভজনক করে গড়ে তোলা দরকার।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উৎপাদনের বিভিন্ন স্বরূপ এ রকম :
i. কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি
ii. বাড়িতে শখে বাগান করা
iii. একটি টেলিভিশন সেট মেরামত করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
যমুনা নদীকে সিরাজগঞ্জের দুঃখ বলা হয়। তারপরও এই নদীর পানি দুই ধারে প্লাবিত হয়ে জমিতে পলি পড়ে। ফলে ফসল ভালো হয়। অনেকে এই নদী থেকে সারাবছর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যদিকে এই মাছ দেশে আমিষের ঘাটতি মেটায়।

২। যমুনা নদীকে ভূমি বলা হয়। কারণ এটি–
i. উৎপাদনে সহায়তা করে
ii. প্রকৃতির দান
iii. এর কোনো উৎপাদন খরচ নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৩। যমুনা নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব হল, এই নদীর-
i. বালু দ্বারা রাস্তা তৈরি হয়
ii. পলিতে ফসল উৎপাদন ভালো হয়
iii. মাছ দেশে আমিষের অভাব অনেকাংশে পূরণ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৪। নিচের কোনটি বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার গতি প্রকৃতিকে নির্দেশ করে?
ক. জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে
খ. জনসংখ্যা স্থির রয়েছে
গ. জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে
ঘ. জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে

নিচের সারণিটি ২০০৬ সালে তিনটি দেশের স্থূল জন্মহার এবং স্থূল মৃত্যুহার দেখায়। সারণিটি দেখে ৫ থেকে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেশ	স্থূল জন্মহার	স্থূল মৃত্যুহার
অস্ট্রেলিয়া	১২.১	৭.৫
বাংলাদেশ	২৯.৮	১১.৪
ইতালি	৮.৭	১০.৪

৫। ২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল-

ক. - ৪.৬ খ. ৪.৬

গ. ৭.৫ ঘ. ১২.১

৬। সরবরাহকৃত উপাত্ত থেকে নিচের কোন উক্তিগুলো প্রমাণ করা যাবে?

i. অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ইতালির জনসংখ্যা থেকে বেশি

ii. ইতালির জনসংখ্যা কমে গেছে

iii. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও iii খ. ii ও iii

গ. iii ঘ. i, ii এবং iii

৭। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে উচ্চ স্থূল জন্মহারের জন্য নিচের কোন উপাদানগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে?

i. উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব

ii. উচ্চ শিশু মৃত্যুরহার

iii. মেয়েদের বিয়ের গড় পড়তা সর্বনিম্ন বয়স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৮। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে-

i. মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় বাড়বে

ii. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে

iii. উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৯। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেলে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তনসমূহ ঘটতে পারে। এর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা সঠিক ?

ক. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় খ. সার্বিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় ঘ. মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পায়

১০। শেফালী তার পরিবারকে ছোট রাখার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাদের সংসারে মাত্র ২টি সন্তান। তারা আর কোনো সন্তান নেবেন না। তাদের এই ব্যবস্থাকে ম্যালথাসের মতে বলা হয় -

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা খ. প্রাকৃতিক নিরোধ

গ. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ঘ. সন্তান সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ

১১। মজুত মূলধনী দ্রব্যের সাথে নতুন মূলধনী দ্রব্য যুক্ত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিকে বলে-

ক. মূলধন খ. সঞ্চয়

গ. বিনিয়োগ ঘ. আয়

১২। রবিন একজন কাঠ মিস্ত্রি। সে বাজার থেকে কাঠ কিনে তা দিয়ে নিজে ও তার ছেলে চেয়ার, টেবিল তৈরি করে। আসবাবপত্রের বিক্রয়লব্ধ মুনাফা দিয়ে সংসারের খরচ নির্বাহ করে। রবিন মিস্ত্রিকে একজন ভালো সংগঠক বলা যায় কারণ তিনি -

i. উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন

ii. ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় সাধন করেন

iii. উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করেন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii এবং iii

১৩। এক ব্যক্তি বহুমুখী কাজ করেন। যেমন (ক) কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করেন, (খ) কক্সবাজারের চিংড়ি ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করেন ও (গ) আলু, টমেটো ইত্যাদি সংরক্ষণ করে পরে সুবিধামতো সময় বিক্রি করেন। এভাবে তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। লোকটির এরূপ আচরণের কারণ হল-

i. পণ্যের উপযোগ বৃদ্ধি করা

ii. মুনাফা অর্জন করা

iii. ব্যবসায় বৈচিত্র্য আনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কৃষক রমজান আলী তার এক একর জমিতে আলুর চাষ করেন। প্রথম বছরে তিনি এক একক শ্রম নিয়োগ করে ৪০ কেজি আলু উৎপাদন করেছেন। এভাবে বেশি উৎপাদনের জন্য পরবর্তী বছরগুলোতে অতিরিক্ত এক একক করে শ্রম বৃদ্ধি করতে থাকেন। তার আলুর উৎপাদন নিচের তালিকায় দেখানো হল :

শ্রমের একক	আলুর মোট উৎপাদন (কেজি)	আলুর মোট উৎপাদন মূল্য (২০ টাকায় ১ কেজি) টাকায়	প্রান্তিক উৎপাদন (টাকায়)	গড় উৎপাদন (টাকায়)
১	৪০			
২	৯০			
৩	১২৬			
৪	১৫৬			

ক. উপরের সারণিটি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি প্রকাশ করে । এই বিধিটির নাম কি ?

খ. উক্ত বিধিটির মূল ধারণা ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের সারণিতে তিনটি খালি কলাম পূরণ কর।

ঘ. বাংলাদেশে কি এ বিধিটি প্রযোজ্য হয়? কেন বা কেন নয়?

২। ২০০৪ সালে এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নিচের সারণিতে দেখানো হল-

দেশসমূহ	জনসংখ্যা ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)
বাংলাদেশ	৯৮৫
ভারত	৩৩৬
শ্রীলংকা	৩১৬
ফিলিপাইন	২৭৭
ভিয়েতনাম	২৫৪
পাকিস্তান	১৯৮
চীন	১৩৭
ইন্দোনেশিয়া	১১৭
মালয়েশিয়া	৭৭

সারণি অনুসারে ২০০৪ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৮৫ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাস করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী?

খ. উপরের টেবিলে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনা কর।

গ. বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার প্রধান প্রধান কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনসংখ্যার ঘনত্বের ওপর নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৩। ম্যালথাসের মতে, মানুষের অতি প্রজনন ক্ষমতার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে কিন্তু খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যার চেয়ে অনেক ধীরে বাড়ে, ফলে অতি শীঘ্রই জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খাদ্যের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। এর পরিণতিতে দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি, মহামারি ইত্যাদি বিপর্যয় নেমে আসবে। এ ধরনের বিপর্যয় কোনো দেশের জন্য কাম্য নয়। সুতরাং জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

ক. দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি ও মহামারি ইত্যাদি বিপর্যয়কে ম্যালথাস কি বলে অভিহিত করেছেন?

খ. জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের সহায়ক একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তথা পরিবার পরিকল্পনা কীভাবে কার্যকর হতে পারে? তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ম্যালথাসের উল্লেখিত বক্তব্য তুমি কতটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের কৃষি

AGRICULTURE OF BANGLADESH

৪.১.১. কৃষি বা কৃষিকাজ

মানুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করাকে কৃষি বা কৃষিকাজ বলে। তাই কৃষি হচ্ছে এমন এক ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কিত কাজ যা শস্য উৎপাদন, পশুপাখি পালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই কৃষিকাজ প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের অধিবাসীদেরও প্রধান পেশা কৃষি।

৪.১.২. কৃষিকাজের দ্বারা আত্মপোষণ ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ

কৃষিকাজ দুটি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে পারে; যেমন আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ।

১. আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ : যে কৃষিকাজের দ্বারা কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে পরিবারের কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে তাকে আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ বলে। কৃষি জমির পরিমাণ কম বলে এ ধরনের কৃষি কাজের দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণের পর সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে যা দিয়ে কৃষক মামুলিভাবে কৃষি কাজ চালিয়ে যায়। এ ছাড়াও ভূমিহীন কৃষকরাও অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ করে থাকে। আত্মপোষণমূলক কৃষিকাজের নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় :

(ক) আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ মূলত নিজকে ও পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই করা হয়। তাই এ কৃষিকাজ মূলত পরিবারের ভোগের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়।

(খ) এ ধরনের কৃষিকাজে কৃষক কেবল তার পরিবারের সদস্যদেরকেই নিয়োজিত করে; বাইরের ভাড়া করা কোনো শ্রমিক নিয়োগ করে না।

(গ) এ কৃষিকাজে মালিক নিজেই চাষাবাদে অংশগ্রহণ করে।

(ঘ) যেসব কৃষিজাত দ্রব্য পরিবারের কাজে লাগে এ কৃষি কাজের দ্বারা কৃষক কেবল সেগুলোই উৎপাদন করে।

২. বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজ : যে কৃষিকাজের দ্বারা কোনো কৃষিজাত পণ্য মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয় তাকে বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ বলে। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ বেশি থাকে। এ কৃষিকাজ এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা যায়। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, নার্সারি, ফুল ও ফলের চাষ এবং বনায়ন ইত্যাদি কৃষিকাজ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজের নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

(ক) বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজে মালিক সরাসরি জমি চাষাবাদ করে না; বরং কৃষিকাজের জন্য ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ করে।

(খ) এ কৃষিকাজের মূল তাগিদই মুনাফা অর্জন, ভোগ নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে যেসব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা বাজারজাত করে মুনাফা লাভের চেষ্টা করা হয়। উৎপাদিত পণ্য পরিবার ভোগ করতেও পারে, নাও পারে। সুতরাং এ কৃষিকাজে পারিবারিক ভোগের বিষয় তেমন একটা গুরুত্ব পায় না।

(গ) মূলত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই এ কৃষিকাজ চলে বলে যেসব পণ্য উৎপাদন করলে বেশি লাভ হয় এ ধরনের কৃষিকাজে সেসব পণ্যই উৎপাদন করা হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কৃষিকাজ দক্ষতা, নিশ্চয়তা ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে হলে আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজের চেয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কৃষিকাজই উত্তম।

বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে সিংহভাগ কৃষকই আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ করে। এ জন্য কৃষিতে উৎপাদিত পণ্যের তেমন উদ্বৃত্ত থাকে না। ফলে কৃষকের আয়ও বাড়ে না। বেশি করে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে কৃষিতে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে হলে আমাদেরকে আত্মপোষণমূলক কৃষিকাজের চেয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কৃষিকাজের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৪.১.৩ কৃষির গুরুত্ব

একটি কৃষি প্রধান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলত কৃষির উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করা হল :

১. প্রধান পেশা : জীবিকা নির্বাহের জন্য বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জীবন ধারণের জন্য কৃষির ওপর জনসাধারণের এত অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্বের প্রমাণ করে।

২. জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান : আমাদের জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ প্রধানত কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২১ ভাগ আসে কৃষি থেকে। সুতরাং একক খাত হিসেবে জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কৃষির উৎপাদন যত বাড়বে ততই জাতীয় ও মাথাপিছু উৎপাদন বাড়বে।

৩. খাদ্যের যোগান : কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণ করে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আমাদের জনগণের জন্য অধিক খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। সেই সাথে দেশে বিদ্যমান খাদ্য ঘাটতিও দূর হবে।

৪. শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগান : দেশে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেগুলোর বেশিরভাগের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান মূলত কৃষি থেকে আসে। পাট, আখ, চা, তামাক প্রভৃতি কৃষিজাত কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে এ দেশের পাট, চিনি, চা ও সিগারেট শিল্প গড়ে উঠেছে।

৫. কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সহায়তা : কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি কৃষি উপকরণের চাহিদা বাড়ে। এর ফলে দেশে এসব উপকরণ প্রস্তুতকারী শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশে কৃষির উন্নতি ঘটলে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি উৎপাদনকারী শিল্প গড়ে উঠবে। এর ফলে দেশে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হবে।

৬. বস্ত্রের সংস্থান : কৃষি আমাদের দেশে জনগণের সহায়তা করে। পাট, তুলা, ভেড়ার লোম ইত্যাদি আঁশ জাতীয় কৃষিপণ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এগুলো এ দেশের জনসাধারণের বস্ত্র চাহিদার অনেকটা পূরণ করে। তাছাড়া পাট থেকে উন্নত মানের কার্পেট ও পর্দার কাপড়ও উৎপাদিত হয়।

৭. বাসস্থান ও জ্বালানির উপকরণ সরবরাহ : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বাসস্থানই বাঁশ, খড়, শন, পাতা, বেত, কাঠ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। এ উপকরণগুলো যোগায় কৃষি। তাছাড়া গাছ ও শুকনো পাতা, পাটখড়ি, শস্যের ভুসি, গোবর প্রভৃতি আমাদের জ্বালানির চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করে। এসবের উৎসও কৃষি। সুতরাং বাসস্থানের উপকরণ যোগান দিয়ে কৃষি গ্রামাঞ্চলে ঘরবাড়ি তৈরি করতে সাহায্য করে। সাথে সাথে জ্বালানির উপকরণ সরবরাহ করে জ্বালানির প্রকট সমস্যা লাঘব করতেও সাহায্য করে।

৮. ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠা : কৃষির মাধ্যমে আমরা জীবনরক্ষাকারী ওষুধের কাঁচামাল পাই। এ দেশের আনাচে কানাচে ও বনাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা ও গাছগাছড়া পাওয়া যায়। এগুলোর ওপর নির্ভর করে কবিরাজি ওষুধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোকেরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য কবিরাজি ওষুধ ব্যবহার করে আসছে।

৯. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা : বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আয় করা হয়। তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি করে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে পারলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ইত্যাদি আমদানি করা যাবে। ফলে দেশে শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুততর হবে।

১০. সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি বিরাট অংশ কৃষিখাত থেকে আসে। জমির খাজনা, কৃষি আয়কর, কৃষিপণ্য পরিবহন ভাড়া, কৃষিজাত পণ্যের ওপর রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি বাবদ সরকারের যথেষ্ট আয় হয়। বর্ধিত পরিমাণ রাজস্ব সরকার দেশ পরিচালনা ও উন্নয়নের কাজে ব্যয় করতে পারেন।

১১. শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি : কৃষির উন্নতির সাথে সাথে কৃষকদের আয় বাড়ে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য তাদের চাহিদাও বাড়ে। এ চাহিদা মেটানোর জন্য দেশে বিদ্যমান কলকারখানাগুলোর প্রসার ঘটে এবং নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠে। তাই দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

১২. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে জাতীয় উৎপাদনে একক খাত হিসেবে কৃষি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বাড়বে। ফলে উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয়ভার অভ্যন্তরীণ সম্পদ দ্বারা মিটানো যাবে। তাই এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

উপসংহার : উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষির উন্নতির ওপরই আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা সর্বাঙ্গীন উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

৪.২.১ বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা উন্নত নয়। এ দেশে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সে জন্যই অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় কৃষি উৎপাদন অনেক কম। নিচে বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

১. অনুন্নত চাষ পদ্ধতি : বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক এখনো প্রাচীন ও অবৈজ্ঞানিক পন্থায় চাষাবাদ করে। উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও কৃষি উপকরণের সাথে এ দেশের বেশিরভাগ কৃষকের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই বললেই চলে। এখানকার কৃষি ব্যবস্থা এখনো সেকেলে, অনুন্নত ও ত্রুটিপূর্ণ।

২. স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা : কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বনিম্ন ফলনশীল দেশগুলোর অন্যতম। যেখানে জাপানে প্রতি একর জমিতে গড়ে ২ টনের বেশি ধান উৎপাদিত হয়, সেখানে বাংলাদেশে তার পরিমাণ মাত্র $\frac{১}{২}$ টনের সামান্য কিছু বেশি।

৩. জীবনধারণের জন্য চাষাবাদ : এ দেশের কৃষক মূলত নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই চাষাবাদ করে। সুতরাং এখানকার কৃষিতে বিক্রয়যোগ্য বিপুল উদ্বৃত্ত সৃষ্টির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। অবশ্য সম্প্রতি উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

৪. ভূমির উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নতা : এ দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই জোত ক্ষুদ্র এবং প্রায়ই তা মাঠের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এ ধরনের ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন জোতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় না। কৃষির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা।

৫. ভূমিহীন কৃষক : বাংলাদেশের কৃষকদের বেশিরভাগই ভূমিহীন। বর্গাদার কিংবা কেবল দিনমজুর হিসেবে তারা অন্যের জমি চাষ করে। জমির প্রকৃত মালিক নয় বলেই চাষাবাদে তারা আগ্রহ বোধ করে না। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়।

৬. অনাবাদি জমি : উপযুক্ত পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে এ দেশের মোট চাষযোগ্য জমির বেশ কিছু অংশ এখনো অনাবাদি রয়েছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব বাস্তবে তা করা যায় না।

৭. প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের কৃষি এখনো মূলত বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। সময়মতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে এখানে ফসল ভালো হয়। নইলে শস্য উৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ফলে জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়।

৮. বেশিরভাগ ভূমি খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত : এ দেশের মোট আবাদি জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। ফলে এখানে কৃষিতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কম উৎপাদিত হয়।

৯. জমির ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা : বাংলাদেশে কৃষি জমির মালিকানায় অসমতা দেখা যায়। বড় ও মাঝারি মিলে প্রায় ৩০ ভাগ কৃষকের হাতে প্রায় ৮০ ভাগ জমি রয়েছে। অন্যদিকে প্রায় ৭০ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক মাত্র ২০ ভাগ জমির মালিক। ফলে দেশের সিংহভাগ কৃষক কৃষি কাজে তেমন উৎসাহ বোধ করে না।

১০. অনুপস্থিত ভূস্বামী : এ দেশের শহরে বসবাসকারী অনেক লোক উল্লেখযোগ্য কৃষি জমির মালিক। জমির মালিক জমি থেকে দূরে থাকায় ঠিকভাবে কৃষিকাজের তত্ত্বাবধান হয় না। ফলে উৎপাদন কম হয়।

১১. বর্গাদারি প্রথা : বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বর্গাদারি বা ভাগচাষ প্রথায় চাষাবাদ করা হয়। মালিক নিজ তত্ত্বাবধানে চাষাবাদ করলে যে পরিমাণ উৎপাদন হয়, তার চেয়ে ভাগচাষে বর্গাদারদের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়। ফলে এখানকার কৃষির উৎপাদনশীলতা অনেক কম।

১২. দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন ও অশিক্ষিত কৃষক : উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির অভাবে এ দেশের কৃষকরা হীনবল ও উদ্যমহীন। সাধারণ শিক্ষার অভাবে একদিকে যেমন তারা গোঁড়া, অদৃষ্টবাদী ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী, তেমনি অন্যদিকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষার অভাবে চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন।

উপসংহার : বাংলাদেশের কৃষির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা খুব কম, কৃষকদের আয় স্বল্প এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। তবে সাম্প্রতিককালে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে কৃষির একর প্রতি ফলন এবং কৃষিতে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪.২.২ বাংলাদেশে কৃষির অনুন্নয়নের কারণ

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানকার কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ও ত্রুটিপূর্ণ। নিচে এ দেশের কৃষির অনুন্নয়নের কারণগুলো বর্ণনা করা হল :

১. পুরাতন পদ্ধতির চাষাবাদ : বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে পুরাতন পদ্ধতির চাষাবাদ প্রচলিত। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত চাষ পদ্ধতি, উন্নত সরঞ্জাম ও উপকরণ ইত্যাদির ব্যবহার নেই বললেই চলে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ তেমন বাড়ে না।

২. জমির উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নতা : বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকদের জোত খণ্ডিত ও মাঠের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এ ধরনের জোতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ প্রবর্তন এবং সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা যায় না।

৩. ঋণের সমস্যা : এ দেশের সিংহভাগ কৃষক দরিদ্র বলে চাষাবাদের জন্য তারা কৃষি ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু বেশিরভাগ

ঋণ বেসরকারি উৎস থেকে সংগৃহীত হয় বলে তা অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। সরকারি উৎস থেকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ অপর্যাপ্ত এবং ঋণদান পদ্ধতি জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ। তাই কৃষকরা জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ তেমন বাড়ে না।

৪. ভূমি মালিকানার অসম বণ্টন : বাংলাদেশের কৃষি জমির মালিকানার বণ্টন অত্যন্ত অসম এবং ত্রুটিপূর্ণ। প্রায় ৩০ ভাগ কৃষক মোট জমির প্রায় ৮০ ভাগের মালিক। অর্ধেকেরও বেশি কৃষক ভূমিহীন। কৃষি জমির এ রকম অসম বণ্টন উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায়।

৫. উত্তম বীজ ও সারের অভাব : শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ এবং রাসায়নিক সারের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও এ দেশে এ দুটি উপকরণেরই যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাছাড়া কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র বলে এগুলো ক্রয়ও করতে পারে না। ফলে নিম্নমানের বীজ ব্যবহার ও প্রয়োজনমাফিক সার প্রয়োগ না করার ফলে উৎপাদন কম হয়।

৬. সেচ সুবিধার অভাব : অব্যাহত ও সুষ্ঠুভাবে চাষাবাদের জন্য কৃষিক্ষেত্রে নিয়মিত পানি সেচ অপরিহার্য হলেও এ দেশে এখনো ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সেচ ব্যবস্থা প্রচলন হয়নি। ফলে এ দেশের কৃষি মূলত বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং কখনো কম আবার কখনো বেশি হয় বলে কৃষি কাজ প্রায়ই বিঘ্নিত হয়।

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রায় প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন বাংলাদেশের শস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে কৃষক জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদনের প্রত্যাশা করে প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক কম ফসল ঘরে তোলে।

৮. ভূমির উর্বরতা হ্রাস : বাংলাদেশের কৃষি জমিগুলো বছরের পর বছর ক্রমাগতভাবে চাষ করা হয় এবং প্রায় একই শস্যের চাষাধীন থাকে। ফলে জমিগুলোতে বিশেষ বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের অভাব দেখা দেয়। সার প্রয়োগের অভাবে এ ঘাটতি পূরণ হয় না। এ অবস্থায় জমিগুলো দিন দিন অনুর্বর হয়ে পড়ছে এবং কম ফসল দিচ্ছে।

৯. কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও শস্যরোগ : পঙ্গপাল ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও শস্যরোগে এ দেশে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ শস্য বিনষ্ট হয়। ফলে মৌসুম শেষে প্রাপ্ত ফসলের পরিমাণ আশানুরূপ হয় না।

১০. জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা : বেশি বৃষ্টিপাত এবং পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে এ দেশের অনেক চাষযোগ্য জমি জলাবদ্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকার অনেক জমি লবণাক্ততার জন্য ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

১১. দুর্বল গ্রামীণ অবকাঠামো : কৃষির উন্নয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো যেমন, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্য, খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এগুলোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে এখানে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় না।

১২. ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা : বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যাদির বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। বাজার ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব, কৃষকদের নিদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতা, গুদাম ঘরের অভাব, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির কারণে ফসল কাটার পরপরই কৃষকরা তা কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা ফসলের ন্যায্য দাম পায় না।

১৩. কৃষকের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা : বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের অধিকাংশই গোঁড়া, অদৃষ্টবাদী এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের নতুন কলাকৌশল প্রবর্তনের ব্যাপারে তারা অজ্ঞ ও উদাসীন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধীও বটে।

১৪. সহকারী পেশার অভাব : গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জন্য সহকারী পেশার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের আয় বাড়ানোর সুযোগ সীমিত। ফলে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটে না। এ জন্য তারা কৃষিকাজে ততটা সক্রিয় হতে পারে না।

১৫. উপযুক্ত সংগঠনের অভাব : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন জোতে কৃষকরা অপরিকল্পিত ও মামুলি ধরনের ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ করে। কৃষি উপকরণ ও কৃষিকাজের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে কৃষকরা কৃষিকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে না।

১৬. সুসমন্বিত কৃষিনীতির অভাব : আমাদের কৃষি কার্যক্রমে কোনো সুসমন্বিত কৌশল অনুসরণ করা হয় না। এ জন্য কৃষিক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত কাঠামোগত রূপান্তর ঘটছে না।

উপসংহার : কৃষিতে এসব সমস্যা বিদ্যমান থাকায় কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অনেকটা অনগ্রসর। ফলে এখানকার কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনেক কম।

৪.৩.১ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি

যে বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল ও উপকরণের সাহায্যে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা হয় তাকে প্রযুক্তি বলে। আর উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির আওতায় আধুনিক যন্ত্রপাতি, উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, পরিমিত পানি সেচ ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি বলে অভিহিত করা হয়। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪.৩.২ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ও ত্রুটিপূর্ণ। এ জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা অতি নিম্ন এবং কৃষকদের আয় খুব কম। এ অবস্থা নিরসনের জন্য কৃষিকাজ এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে কৃষির ফলন বৃদ্ধি পায়, কৃষকদের আয় বাড়ে এবং কৃষিক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। এ জন্য এ দেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। নিচে এ দেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

১. চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার : কৃষিতে অধিক উৎপাদনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টার ইত্যাদির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সীমিত আকারে এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকেরা দরিদ্র এবং জমি খন্ড-বিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার : কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছুকাল ধরে বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট' গত প্রায় ২৫ বছরে ২২ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ উদ্ভাবন করেছে। এ ধান বীজগুলো একর প্রতি ফলন মৌসুম ভেদে ৪০ থেকে ৮০ মণ। বর্তমানে প্রতি বছর দেশের ৩০ শতাংশ জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের মাধ্যমে ৭০ লক্ষ টন বাড়তি চাল উৎপাদন করা হয়। গম চাষের ক্ষেত্রেও উচ্চ ফলনশীল গম বীজের ভূমিকা অনন্য। স্বাধীনতা পূর্বকালে যেখানে বছরে গম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র প্রায় ১ লক্ষ টন, সেখানে বর্তমানে গমের উৎপাদন প্রায় ৭.৩৭ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে।

৩. সারের ব্যবহার : অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সারের পরিমিত ব্যবহার কৃষির ফলন কয়েক গুণ বাড়াতে পারে। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশে দীর্ঘকাল থেকে গোবর একটি উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য ষাট দশকের গোড়ার দিক থেকে দেশে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার, যেমন, ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সার প্রয়োগের দরুন যে খরচ হয় তা মোট আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উঠে আসে। তাছাড়া সারের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে ফসলী জমির পরিমাণ ঠিক রেখেও বছরে কয়েকবার চাষ করে অনেক বেশি ফসল ফলানো যায়।

৪. কীটনাশকের ব্যবহার : বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিবছর কীট পতঙ্গের আক্রমণ ও শস্যরোগের দরুন শস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। পোকামাকড়ের আক্রমণ ও শস্যরোগের দরুন যাতে ফসল নষ্ট না হয় সে জন্য বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইরি ধানের চাষ করতে গিয়ে বর্তমানে অধিকমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫. আধুনিক সেচ যন্ত্রপাতির ব্যবহার : সুষ্ঠুভাবে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য জমিতে প্রয়োজন মাফিক পানিসেচ একান্ত দরকার। বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল বীজ চাষের ক্ষেত্রে পানির প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিকাজ মূলত বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। এ বৃষ্টিপাত আবার অনিয়মিত, কম বা বেশি হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষিতে যান্ত্রিক উপায়ে পানি সেচ করা প্রয়োজন। এ দেশে বর্তমানে গভীর ও অগভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদির সাহায্যে পানি সেচ করা হয়। তাছাড়া নদী, বিল বা হাওর থেকে খাল কেটে অথবা নদী, খাল, বিল, ডোবা ইত্যাদি থেকে কাঠের তৈরি দোন বা ডোঙ্গার সাহায্যে পানি সেচ করা হয়।

৪.৩.৩ সমবায়

একাধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কোনো সংঘ বা সমিতি গঠন করলে তাকে সমবায় বলে। মানুষের একক প্রচেষ্টায় যা করা সম্ভব নয় দশ জনের যৌথ প্রচেষ্টায় তা অতি সহজেই করা যায়। সমাজের বিত্তহীন ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সাম্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে পরস্পরের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে প্রতিষ্ঠান বা সমিতি গঠন করে তাই সমবায়। মূলত সমবায় হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা সমিতি যেখানে সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষেরা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সমঅধিকারের ভিত্তিতে একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করে। 'একতাই বল' এবং 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' সমবায়ের মূলমন্ত্র।

৪.৩.৪ বাংলাদেশের কৃষিতে সমবায়ের ভূমিকা

বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি ব্যবস্থা নানাভাবে সমস্যাগ্রস্ত। এ জন্য এ দেশ কৃষিক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিচে বাংলাদেশের কৃষিতে সমবায়ের ভূমিকার বিবরণ দেওয়া হল :

১. কৃষিজোত একত্রীকরণ : বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষিজোত উপবিভক্ত ও বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োগ, ঘন ঘন জমি বিক্রয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণ জোতের এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। এ ধরনের জোতে সুষ্ঠুভাবে কৃষিকাজ পরিচালনা করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন জোতগুলো একত্রিত করে এমন জোত গঠন করতে পারে যেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করা যায়।

২. যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ : বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ছাড়াই চাষাবাদ করা হয়। ফলে একদিকে সময়, শ্রম ও সম্পদের অপচয় ঘটে এবং অন্যদিকে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণও অত্যন্ত কম হয়। এ অবস্থা নিরসনের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা প্রয়োজন। তবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য কৃষি জোতের আয়তন বড় হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে সমবায় যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন কৃষি জোতগুলোকে একত্রিত করে বৃহৎ জোত গঠন এবং সেখানে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা যায়।

৩. কৃষি ঋণ সরবরাহ : বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকই দরিদ্র। কৃষিকাজ করে তারা যা আয় করে তা দিয়ে তারা কেবল কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাই করতে পারে; কৃষি কাজের জন্য উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। বাধ্য হয়ে কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন উৎস থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অনেক

ক্ষেত্রেই ঋণ গ্রহণ করতে গিয়ে তারা প্রতারিত হয়। এ অবস্থায় গ্রাম সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা যেতে পারে। এ সমিতিগুলো সদস্য কৃষকদের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে কৃষিকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্য করতে পারে।

৪. জলসেচের ব্যবস্থা : অব্যাহতভাবে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ অপরিহার্য। গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন ও খাল কেটে নদী বা পুকুর থেকে শস্যক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। তবে জলসেচের এ ধরনের ব্যবস্থার প্রবর্তন একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার। বাংলাদেশের কৃষকরা দরিদ্র বলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা সমবায়ের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করে সারাবছর ধরে চাষাবাদ করতে পারে।

৫. কম দামে কৃষি উপকরণসমূহ ক্রয় : কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে ভারি ও ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। খুচরা দামে এসব উপকরণ ক্রয় করতে গেলে খরচ বেশি পড়ে যা অনেক কৃষকই যোগাতে পারে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য সমবায় ক্রয় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পাইকারি দামে সার, বীজ, কীটনাশক, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করে সদস্য কৃষকদের কাছে সুলভে বিক্রয় করা যায়।

৬. শস্য বীমা প্রবর্তন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন শস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর ফলে একদিকে অনেক কৃষকই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উৎপাদনের পরিমাণও অনেক কমে যায়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য শস্য বীমা প্রবর্তন করা আবশ্যক। শহরে অবস্থিত বীমা কোম্পানিগুলোর পক্ষে গ্রামের অসংখ্য কৃষকের জন্য এর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় গ্রামে গ্রামে গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে শস্য বীমা প্রবর্তন করে কৃষকদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

৭. ফসল গুদামজাতকরণ : ফসল গুদামজাত করে রাখতে পারলে তা সংরক্ষণ করা যায় এবং ধীরে ধীরে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ফলে ফসলের উপযুক্ত দাম পাওয়া যায়। এ জন্য গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক গুদামঘর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত পণ্যের গুদামজাতকরণের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ফসল কাটার পর পরই কম দামে কৃষকরা তা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে গুদাম ঘর নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা গ্রামে গ্রামে গুদাম ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করতে পারে। গুদাম ঘর নির্মিত হলে কৃষকরা সেখানে ফসল গুদামজাত করে যথাসময়ে বিক্রয় করলে ফসলের উপযুক্ত দাম পাবে।

৮. কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম প্রাপ্তি : কৃষকদের আয় বাড়াতে হলে তারা যাতে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য কৃষিপণ্যের উন্নত বাজার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বলে কৃষকরা পণ্যের ন্যায্য দাম পায় না। দালাল, ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী কৃষিজাত পণ্য ক্রয়ে কৃষকদেরকে নানাভাবে প্রতারিত করে। এ অবস্থায় সমবায় ভিত্তিক বিক্রয় সমিতি গঠনের মাধ্যমে কৃষকদেরকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা এবং পণ্যের ন্যায্য দাম প্রাপ্তিতে সাহায্য করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের কৃষিতে সমবায়ের গুরুত্ব অনেক। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা হলে তা এ দেশের কৃষির অনেকগুলো সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

৪.৩.৫ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমবায় চাষের গুরুত্ব

কোনো এলাকার জমির মালিকরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমিগুলো একত্রিত করে চাষাবাদ করলে তাকে সমবায় চাষ পদ্ধতি বলে। এর আওতায় গঠিত খামারকে বলে সমবায় খামার। সমবায় খামারে সাধারণত সদস্যদের জমির মালিকানা বজায় থাকে। কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলোর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সমিতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে উৎপাদিত পণ্য জমির পরিমাণ, গুণাগুণ ও প্রদত্ত শ্রম অনুপাতে সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বাংলাদেশে কৃষিতে আধুনিক

প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলতে গেলে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের কথা এসে যায়। কারণ আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণ যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ট্রাক্টর,পাওয়ার টিলার, হারভেস্টার, পরিমিত পানি সেচের জন্য পাম্প,গভীর অগভীর নলকূপ ইত্যাদি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অথচ আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক দরিদ্র। তাদের প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এগুলো ক্রয় ও ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কৃষকেরা যদি সমবায় চাষ পদ্ধতির আওতায় জমিগুলো একত্রিত করে তাহলে যৌথভাবে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ কৃষকরা ক্রয় ও ব্যবহার করতে পারবে। দেশে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হবে এবং এর প্রসার ঘটবে। এর ফলে কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। তাই বলা যায়, আমাদের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪.৪.১ স্বকর্মসংস্থান

নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পেলে তাদেরকে বেকার বলে। আমাদের কৃষিতে এ ধরনের বেকার লোকদের সংখ্যা অনেক বেশি। জীবিকা অর্জনের জন্য যখন বেকার লোকেরা অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের উদ্যোগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাকে স্বকর্মসংস্থান বলে।

৪.৪.২ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে স্বকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়

বাংলাদেশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল লোকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক লোকই বেকার। কৃষিখাতে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা যায়। বসতবাটির আঙিনা কিংবা তার আশপাশ, নিজেদের অথবা চুক্তির ভিত্তিতে অন্যের কাছ থেকে নেওয়া সামান্য কিছু জমি, পুকুর কিংবা ডোবা ব্যবহার করে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। আজকাল হাঁস-মুরগি পালন, মাছের চাষ, নার্সারি, ফুল ও ফলের বাগান, পশু পালন ইত্যাদির মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। একক বা যৌথ উদ্যোগে গৃহীত এরূপ কার্যক্রমে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, গ্রামীণ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ ঋণ ও পরামর্শ প্রদান করছে। নিচে আমাদের দেশে কৃষিখাতে স্বকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

১. মুরগি পালন : সামান্য পুঁজি নিয়ে নিজের বসতবাটির বারান্দা, আঙিনা কিংবা সংলগ্ন জায়গায় মুরগি পালনের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। ১টি মোরগ ও ৮-১০টি মুরগি নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে মুরগি পালন শুরু করা সম্ভব। সামান্য কিছু পুঁজি হলে অল্প জমি নিয়ে মুরগি খামার স্থাপন করা যেতে পারে।

    স্বকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে ছোটখাট মুরগি খামার গড়ে তুলতে হলে ব্রয়লার খামার অথবা লেয়ার খামার স্থাপন করা যায়। মাংস উৎপাদনশীল কচি মুরগিকে ইংরেজিতে ব্রয়লার বলে। ব্রয়লার খামার স্থাপনের জন্য মুরগির বাচ্চা উৎপাদনকারী কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সুস্থ ও সবল বাচ্চা সংগ্রহ করা যায়। ব্রয়লার মুরগি ৬-৮ সপ্তাহেই বিক্রয় করা যায়, তাই অল্প দিনের মধ্যেই বিনিয়োগকৃত মূলধন লাভসহ উঠে আসে। তাছাড়া এ ধরনের খামার স্থাপনে খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। ডিমপাড়া মুরগি যাকে ইংরেজিতে 'লেয়ার' বলে তা দিয়েও মুরগি খামার স্থাপন করা যেতে পারে। একে লেয়ার খামার বলে। সাধারণত ৮ সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি বয়সের বাড়ন্ত মুরগি দিয়ে এ খামার শুরু করা যায়। উন্নত ব্যবস্থাপনায় লেয়ার মুরগি বছরে ২৭০-২৮০টি ডিম দেয়। ডিমের উচ্চ দামের প্রেক্ষিতে লেয়ার ফার্ম একটি লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২. হাঁস পালন : আবহমানকাল থেকে এ দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পরিবারই হাঁস পালন করে আসছে। বাড়ির পাশে পুকুর, ডোবা, দীঘি, হাওর ইত্যাদিতে পানির যে পরিবেশ বিরাজ করে তা হাঁস পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পুকুর পাড়ে কিংবা পানির ওপর স্থায়ী অথবা ভাসমান মাচাতে হাঁসের ঘর তৈরি করে সেখানে হাঁস পালন করা যায়।

    বিদেশি উন্নত জাতের খাকি কেম্বেল ও জিনডিং জাতের হাঁস বছরে ২০০-২৫০টি ডিম পাড়ে। এরা আমাদের পরিবেশে ভালোভাবে টিকে থাকে। সাধারণত তিন থেকে সাড়ে তিন মাস বয়সের বাড়ন্ত হাঁস নিয়ে এ ধরনের খামার আরম্ভ করা যায়।

৩. মাছ চাষ : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মাছ চাষ স্বকর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উপায় হিসেবে গণ্য হয়। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলের অনেক বেকার যুবক এ পেশার সাথে জড়িত হচ্ছে। বন্ধ অথবা মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ করা যায়। পুকুর, দীঘি, হাওর এলাকাকে বন্ধ জলাশয় এবং নদী, বিল এলাকাকে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় বলে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মাছ চাষের কলাকৌশল অনেক উন্নত হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল নতুন নতুন প্রজাতির মাছ এ দেশে আনা হচ্ছে। প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য বিভাগ সরকারি পর্যায়ে মাছ চাষের ব্যাপারে কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা দিচ্ছে। অন্যান্য কাজের তুলনায় মাছ চাষে পুঁজি লাগে কম, অথচ আয় হয় বেশি। তাছাড়া এখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেক অবসর সময় পাওয়া যায় যা অন্য কাজে ব্যয় করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। এসব সুযোগ-সুবিধার ফলে স্বকর্মসংস্থানের অন্যান্য উপায়গুলোর মধ্যে মাছ চাষ ক্রমান্বয়ে অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

৪. নার্সারি : যে জায়গায় চারা উৎপাদন করে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে। নার্সারিতে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, পেঁপে, লেবু ইত্যাদি ফলের চারা থেকে শুরু করে মেহগনি, সেগুন, কড়ই, শাল, গর্জন চাপালিশ ইত্যাদি গাছের চারাও উৎপাদন করা যায়। বৃক্ষ রোপণের জন্য প্রয়োজনমতো চারা সংগ্রহ, বিতরণ ও বপনে সাহায্য করা, বিভিন্ন বয়সের চারা মজুদ রাখা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নার্সারি করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামীতে নার্সারি স্বকর্মসংস্থানের একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় উপায় হিসেবে চিহ্নিত হবে।

৫. ফুল ও ফলের বাগান : স্বকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে ফুল ও ফলের বাগান করা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে সাথে ফুলের চাহিদা বাড়ছে এবং এর বাজারও বিস্তৃত হচ্ছে। আগামীতে তাই ফুলের বাগান করা স্বকর্মসংস্থানের একটি সম্ভাবনাময় উপায় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বাড়ির আঙিনায়, সামনে অথবা পেছনের জায়গায় ও ছাদে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুলের বাগান করা যায়। যেসব ফুলের দৈনন্দিন চাহিদা আছে, সেগুলোর চাষ লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সামান্য পুঁজি ও স্বল্প শ্রমের মাধ্যমে ফুলের বাগান করা সম্ভব।

নিজেদের যদি বেশি পরিমাণ জমি থাকে কিংবা অন্যের কাছ থেকে চুক্তির ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদের জন্য বেশি পরিমাণ জমি ভাড়া নেওয়া যায় তবে সেখানে ফলের বাগান করা যেতে পারে। আজকাল পেয়ারা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলো একবছরের মধ্যেই ফল দেয়। তাছাড়া আম, কুল, জামরুল ইত্যাদি ফলের কলম করলে স্বল্প সময়েই এগুলোর কলম করা গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ফলগুলো উন্নত জাতের হওয়ায় তা বাজারে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বিক্রয় করা সম্ভব। পেয়ারা, পেঁপে,লেবুর বাগান খুব ছোট করে শুরু করলে তা বাড়ির ছাদ, আঙিনা ইত্যাদি জায়গাতেও করা যেতে পারে।

৬. পশু পালন : প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের অধিবাসীরা পশু পালন করে আসছে। কৃষিকাজ পরিচালনা, পরিবহন, মাংস ও দুধ সরবরাহ, পশমি বস্ত্র তৈরি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের লোকেরা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গবাদি পশু পালন করে থাকে। তবে বেশি শস্য উৎপাদনের জন্য জমি, শস্যাদির স্থানান্তর, দুধ ও মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে গবাদি পশুর চাহিদা বর্তমানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জন্য পশু পালন সাম্প্রতিককালে একটি লাভজনক পেশা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এখন দেশের অনেক বেকার লোক পশু পালনকে স্বকর্মসংস্থানের একটি অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

আমাদের দেশে গবাদি পশুর খামারগুলো মূলত দুধই উৎপাদন করে। পারিবারিক পর্যায়ে ২-৫টি উন্নত জাতের গরু নিয়ে দুধের খামার গড়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ ও সরকারের পশু পালন অধিদপ্তর থেকে কারিগরি পরামর্শ দেওয়া হয়।

৪.৫.১ বাংলাদেশের কৃষিজাত ফসলসমূহ : খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের প্রায় ৭০ ভাগ জমিতেই কৃষিকাজ চলে। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক ভিত্তিতে বিভিন্ন

ধরনের শস্যের চাষাবাদ করা হয়। উৎপাদিত এসব শস্যকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল।

যেসব শস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে খাদ্যশস্য বলে। এ শস্যগুলো মূলত পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদিত হয়; তবে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনা হয় অথবা প্রয়োজনবোধে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, যব, ভুট্টা, আলু, ফলমূল, শাকসবজি, মশলা ইত্যাদি প্রধান খাদ্য শস্য। অপরদিকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় সেগুলোকে অর্থকরী ফসল বলে। এসব ফসল মূলত বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই উৎপাদিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, রবার প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল।

৪.৫.২ বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের বিবরণ

বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, যব, ভুট্টা, আলু, ফলমূল, মশলা, শাকসবজি প্রভৃতি প্রধান। নিচে বাংলাদেশের এসব খাদ্যশস্যের বিবরণ দেওয়া হল :

১. ধান : ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান থেকে প্রস্তুতকৃত চাল এ দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। এ দেশে মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ধান চাষ করা হয়। নদী বিধৌত পলিময় ও বেশি কাদাযুক্ত সমতল ভূমি এবং ১৬° সে. থেকে ৩০° সে. উত্তাপ ও বার্ষিক ১০০ সেমি থেকে ৩৫০ সেমি বৃষ্টিপাত ধান চাষের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু এ রকম হওয়ায় এ দেশের প্রায় সর্বত্রই ব্যাপকভাবে ধানের চাষ হয়। তবে বরিশাল, পটুয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়।

   বাংলাদেশে প্রধানত আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদিত হয়। তবে সাম্প্রতিককালে এ তিন ধরনের ধান ছাড়া বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের চাষ করা হয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর বিশাল জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত ধান এখানে উৎপাদিত হয় না। তাই প্রতিবছর বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ চাল আমদানি করতে হয়। আমাদের দেশে বার্ষিক প্রায় ২.৭৩ কোটি মে. টন ধান উৎপন্ন হয়।

২. গম : বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরেই গমের স্থান। গম থেকে প্রাপ্ত আটা ও ময়দা বর্তমানে এ দেশের অধিবাসীদের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাসহ সমতল ভূমি, ১৬° সে. থেকে ২২° সে. উত্তাপ এবং বার্ষিক ৪০ সেমি থেকে ১০০ সেমি বৃষ্টিপাত গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু গম চাষের জন্য বিশেষ অনুকূল নয়; তবে এ দেশে শীতকালে জলবায়ু মোটামুটিভাবে গম চাষের উপযোগী। এখানে শীতকালে সীমিত পর্যায়ে গমের আবাদ করা হয়। বাংলাদেশে গড়ে প্রায় ৯.৮৮ লক্ষ একর জমিতে গম চাষ করা হয়। দেশে গম উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলো হল টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ফরিদপুর ও ঢাকা। ক্রমাগত খাদ্য ঘাটতি, ধানের উচ্চ মূল্য, গমের অনুকূলে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে গম চাষের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। এ দেশে বার্ষিক গম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭.৩৭ লক্ষ মে. টন।

৩. ডাল : ডাল বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকার একটি অন্যতম উপাদান। সাধারণত ১৫° সে. থেকে ২০° সে. উত্তাপ ও পানি নিষ্কাশনসহ বালুময় মাটিই ডাল চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ দেশে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৭.৬৯ লক্ষ একর জমিতে ডাল চাষ করা হয়। বাংলাদেশে শীতকাল এবং পদ্মা ও যমুনার দোয়াব অঞ্চল ডাল চাষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তবে দেশের অন্যান্য স্থানেও ডালের চাষ হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ডাল উৎপন্ন হয়। এসব ডালের মধ্যে মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই, মটর, খেসারি, অড়হর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ দেশে বছরে প্রায় ২.৫৯ লক্ষ মে. টন ডাল উৎপাদিত হয়।

৪. তেলবীজ : সাধারণত সয়াবিন, জলপাই, বাদাম, নারিকেল, তিল, তিসি, তুলাবীজ, সরিষা, সূর্যমুখী প্রভৃতি বীজ থেকে উদ্ভিদ তেল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার তেল বীজের মধ্যে সরিষা, রাই, বাদাম,

তিল, তিসি, সয়াবিন, নারিকেল, রেড়ি প্রভৃতি প্রধান। উদ্ভিদ তেল রান্নার কাজ ছাড়াও সুগন্ধি দ্রব্যাদি, বার্নিস, মোমবাতি, সাবান ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ দেশের শীতকালীন জলবায়ু তেলবীজ চাষের উপযোগী বলে এখানে অধিকাংশ তেলবীজের চাষ শীত মৌসুমেই করা হয়। বাংলাদেশে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় বেশি তেলবীজ উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত তেলবীজ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় আমাদেরকে প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রচুর ভোজ্য তেল ও তেলবীজ আমদানি করতে হয়। দেশে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ টন তেলবীজ উৎপাদিত হয়।

৫. যব : গমের মতো যবও এক প্রকার দানাদার শস্য। যবের রুটি, ছাতু ইত্যাদি সহজপাচ্য খাবার। যব থেকে রোগীদের আদর্শ খাবার বার্লি তৈরি হয়। যব চাষের জন্য ১০° সে. থেকে ১৩° সে. উত্তাপ এবং ৪০ সেমি থেকে ৬০ সেমি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের জলবায়ু যব চাষের জন্য উপযোগী নয় বলে এখানে খুব বেশি পরিমাণ যব উৎপাদিত হয় না। এ দেশে বার্ষিক গড়ে প্রায় ২০ হাজার একর জমিতে যব চাষ করা হয়। এ দেশে রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলায় যব উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১৪ হাজার টন যব উৎপাদিত হয়।

৬. ভুট্টা : বাংলাদেশের দরিদ্র লোকদের কাছে ভুট্টার আটা ও খৈ মুখরোচক খাদ্য হিসেবে গণ্য হয়। গ্লুকোজ উৎপাদনেও এটি প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি, ১০০° সে. থেকে ১৫০° সে. উত্তাপ এবং ৫০ সেমি থেকে ১০০ সেমি বৃষ্টিপাত ভুট্টা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু ভুট্টা চাষের জন্য উপযোগী নয়; তাই এখানে ভুট্টার চাষ খুব কম হয়। এ দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী ও পাবনা জেলায় ভুট্টার চাষ হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫২২ হাজার টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়।

৭. আলু : এ দেশে দুধরনের আলু উৎপাদিত হয়; যথা গোল আলু ও মিষ্টি আলু।

ক. গোল আলু : বাংলাদেশে তরকারি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গোল আলু একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পানি সেচের সাহায্যে এ দেশে শীতকালে এ আলুর চাষ করা হয়। দেশের প্রায় সর্বত্রই গোল আলুর চাষ হয়। তবে ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় বেশি আলু উৎপন্ন হয়। দেশে বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টন গোল আলু উৎপাদিত হয়।

খ. মিষ্টি আলু : বাংলাদেশে দরিদ্র লোকেরা প্রধান খাদ্যের বিকল্প হিসেবে মিষ্টি আলু আহার করে। এ দেশে নদীর চর অঞ্চলের বালুময় জমিতেই মিষ্টি আলুর বেশি চাষ হয়। প্রধানত ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, ঢাকা, নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় মিষ্টি আলুর চাষ হয়। দেশে বার্ষিক প্রায় ৫.৮০ লক্ষ টন মিষ্টি আলু উৎপাদিত হয়।

৮. ফলমূল : বাংলাদেশের খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে ফলমূলের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে এ দেশে নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য ফলের চাষ করা হত। কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর চাষ করা হচ্ছে। এ দেশে উৎপাদিত ফলমূলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, কুল, বেল, আনারস, লিচু, তরমুজ, নারিকেল, কমলালেবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাটি ও আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফল কম বেশি পরিমাণে জন্মে। তবে রাজশাহী ও দিনাজপুরে আম ও লিচু, ঢাকার মুন্সীগঞ্জে কলা, সিলেটে আনারস, খুলনায় নারিকেল অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

৯. শাকসবজি : বাংলাদেশের প্রায় জায়গাতেই বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদিত হয়। এ দেশে উৎপাদিত শাকসবজির মধ্যে লাউ, কুমড়ো, পটল, ঝিঙে, বেগুন, শসা, কলা, করলা, কপি, টমেটো, বরবটি ও বিভিন্ন ধরনের শাক উল্লেখযোগ্য। এ দেশের জনসাধারণ এসব শাকসবজি ব্যাপকভাবে আহার করে থাকে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১২.৫০ লক্ষ টন শাকসবজি উৎপাদিত হয়।

১০. মশলা : মশলা প্রধানত খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। মশলা উৎপাদনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা

ও অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন জলবায়ু মশলা চাষের পক্ষে উপযোগী। এ দেশে প্রায় সব জায়গায় বিভিন্ন প্রকার মশলা, যেমন, মরিচ, পিঁয়াজ, আদা, রসুন, হলুদ, ধনিয়া প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। অন্যান্য মশলা যেমন, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা প্রভৃতি এ দেশে উৎপাদিত হয় না বলে তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। দেশে বছরে প্রায় ১৪.০৬ লক্ষ টন মশলা উৎপাদিত হয়।

৪.৫.৩ বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাট, চা, তামাক, তুলা, রেশম, রবার প্রভৃতি প্রধান। নিচে এসব ফসলের বিবরণ দেওয়া হল :

১. পাট : বাংলাদেশের অর্থকরী বা বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে পাটই প্রধান। বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বাংলাদেশে জন্মে। উৎকৃষ্ট জাতের পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি থেকে পাওয়া যায়। পাট থেকে চট, বস্তা, থলি, কার্পেট, পর্দার কাপড় প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

   পাট চাষের জন্য পলিযুক্ত হালকা দোঁআশ মাটি, ২০০° সে. থেকে ২৬০° সে. উত্তাপ এবং ২০০ সেমি থেকে ২৫০ সেমি বৃষ্টিপাত আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই মাটি ও জলবায়ু এ রকম হওয়ায় এখানে প্রায় সব জায়গাতেই পাটের চাষ হয়। তবে ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর ও যশোর জেলাতে বেশি পাট উৎপাদিত হয়। দেশে বর্তমানে বার্ষিক ১০.৩৪ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হয়। এ দেশে বছরে প্রায় ৪৮.৮৪ লক্ষ মে. টন পাট উৎপন্ন হয়।

২. চা : চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। শারীরিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করার ক্ষেত্রে চা একটি হালকা পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চা চাষের জন্য ১৬° সে. থেকে ২৭° সে. উত্তাপ এবং ১৫০ সেমি থেকে ২৫০ সেমি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। একই সাথে ঢালু দোঁআশ মাটি চা চাষের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ঢালু, টিলা ও পাহাড়িয়া অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানে তাই প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে দেশে ১৫৮টি চা বাগান আছে এবং প্রায় ১.৩০ লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ করা হয়। আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা প্রায় ৭ ভাগ চা রপ্তানি থেকে আসে। দেশে বছরে প্রায় ৫৮ হাজার মে. টন চা উৎপন্ন হয়।

৩. আখ : আখ বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। আখ চিনি ও গুড় উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আখ চাষের জন্য সাধারণত পলিযুক্ত অথবা কাদাযুক্ত দোঁআশ মাটি, ২৪° সে. থেকে ২৭° সে. উত্তাপ এবং ১০০ সেমি থেকে ১৫০ সেমি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের কতকগুলো এলাকার মাটি ও জলবায়ু এ রকম হওয়ায় সেখানে ব্যাপকভাবে আখের চাষ হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩.৭১ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ করা হয়। এ দেশের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর আখ জন্মে। দেশে বছরে প্রায় ৫৭.৭০ লক্ষ মে. টন আখ উৎপন্ন হয়।

৪. তামাক : তামাক বাংলাদেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। সিগারেট ও বিড়ি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল তামাক; এ ছাড়া কীটনাশক ওষুধ তৈরিতেও এটি ব্যবহৃত হয়। তামাক চাষের জন্য হালকা দোঁ-আশ মাটি, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের মাটি ও শীতকালীন জলবায়ু তামাক চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ দেশে মোট তামাক উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ কেবল রংপুর জেলাতেই উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া নীলফামারী, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজশাহী জেলাতেও তামাকের চাষ হয়। এ দেশে বার্ষিক প্রায় ৭৬ হাজার একর জমিতে তামাক চাষ করা হয়। দেশে বছরে প্রায় ৩৯ হাজার মে. টন তামাক উৎপন্ন হয়।

৫. তুলা : তুলা বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অল্পবিস্তর তুলার চাষ হচ্ছে। তুলা চাষের জন্য উর্বর, হালকা চুনযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনক্ষম দোঁআশ মাটি, উষ্ণ জলবায়ু ও ৭৫ সেমি থেকে ১০০ সেমি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু তুলা চাষের পক্ষে উপযোগী নয়।

তাই দেশে খুব কম তুলা উৎপন্ন হয়। এ দেশে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে তুলা চাষ করা হয়। বাংলাদেশে যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ অঞ্চলে কিছু কিছু তুলার চাষ হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ০.৭৪ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদন হয়।

৬. রেশম : রেশম বাংলাদেশের আর একটি সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। তুঁত গাছের গুটি পোকার দেহ থেকে যে তন্তু পাওয়া যায় তাকেই রেশম বলে। রেশম দ্বারা উন্নতমানের অত্যন্ত মসৃণ ও মূল্যবান বস্ত্র তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে তুঁত গাছের চাষ তেমন একটা প্রসার লাভ করেনি। তাই রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বাংলাদেশের একমাত্র রাজশাহী ও নওয়াবগঞ্জ জেলাতেই দেশের শতকরা ৭০ ভাগ তুঁত গাছের চাষ হয়। এ দুটি জেলা ছাড়া বগুড়া, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, ময়মনসিংহ, সিলেট জেলাতেও কিছু কিছু রেশম উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ৪ হাজার টন রেশম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

৭. রবার : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রবার একটি সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। রবার চাষের জন্য দোঁআশ ঢালু মাটি এবং ২০° সে. থেকে ২৭° সে. উত্তাপ এবং মোটামুটি র্বাষিক ২০০ সেমি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু রবার চাষের পক্ষে তত উপযোগী নয়। এখানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চল বা উঁচু জমিতে রবারের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে অল্প সময়ের মধ্যেই রবার চাষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রবার চাষে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে এ দেশে বার্ষিক প্রায় ৯০ হাজার একর জমিতে গড়ে ৭শ' টন রবার উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সেলিম ছেলেবেলা থেকে বাবার কৃষি কাজে সহায়তা করে আসছে। তাদের উৎপাদিত ফসল নিজেদের ভোগের কাজে লাগে। পরবর্তীতে সেলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করার পরও হাঁস-মুরগি পালন ও মাছ চাষ করছে, যা থেকে বর্তমানে তার প্রচুর আয় আসছে। সেলিমের কৃষি খামারের প্রকৃতি হচ্ছে-

i. আত্মপোষণমূলক ii. বাণিজ্যিক
iii. স্বকর্মসংস্থানমূলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

২। বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে চাষাবাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন-

ক. সারের ব্যবহার খ. কীট নাশকের ব্যবহার
গ. পানিসেচ ব্যবস্থা ঘ. উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার

৩। কৃষির উন্নতির ওপরই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল কারণ কৃষি -

i. খাদ্যের যোগান দেয়
ii. রাজস্ব বৃদ্ধি করে
iii. ঋণের সমস্যা দূর করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৪। বাংলাদেশে কৃষিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হল-

ক. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা খ. কৃষি শ্রমিকদের শ্রম লাঘব করা
গ. সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস ঘ. গ্রামীণ জনসংখ্যার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জাফর আলী একজন কৃষক। সে তার জমিতে ধান, পাট, আলু, গম, ভুট্টার চাষ করে থাকে। এবার সে কিছু জমিতে আখের চাষও করেছে। উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করে বাকিটা সে বাজারে বিক্রি করে দেয়।

৫। জাফর আলীর উৎপাদিত শস্যের বিবরণ নিম্নরূপ :

i. ধান, গম ও আলু
ii. ভূট্টা, ডাল ও চা
iii. মিষ্টি আলু, শাকসবজি ও আখ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

৬। জাফর আলী যে ফসল উৎপাদন করছে তার মধ্যে অর্থকরী ফসল হলো-

i. পাট
ii. শাকসবজি
iii. আখ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও ii　　ঘ. i ও iii

৭। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদের গুরুত্ব হল :

i. ক্ষুদ্র পুঁজি সমূহকে একত্রিত করে উৎপাদন পরিচালনা
ii. সমন্বিত চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি
iii. যৌথভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চাঁন মিয়া কক্সবাজার জেলার একজন গরীব ধান চাষি। তার নিজের জমি নেই। তিনি সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন। তিনি সেচ পদ্ধতিতে ধান চাষ করেন না। তাছাড়া জমিতে কীট নাশক ও সার ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন না। এ জন্য তাঁর জমিতে ফসল কম হয়। চাঁন মিয়ার মতো অনেক কৃষক কৃষি ব্যাংক, সমবায় সমিতি এবং এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন। ফলে তাঁরা তাঁদের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করেছেন। এসব দেখে চাঁন মিয়াও কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে নতুন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা শুরু করেন।

ক. কৃষি কাজ কী?
খ. সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ বলতে কী বুঝায়? - ব্যাখ্যা কর।
গ. চাঁন মিয়া কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কী ধরণের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন?
ঘ. বাংলাদেশে চাঁন মিয়ার মতো কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনে সমবায় সমিতির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

২। কামাল ও জামাল দুই বন্ধু। তারা উচ্চ শিক্ষিত যুবক। দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও কোনো ভালো চাকরি না পেয়ে তাদের আর এক বন্ধুর পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর উক্ত সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তাদের গ্রামের পুকুরে সমন্বিত মাছ ও হাঁসের চাষ শুরু করে। আর পুকুরের পাড়ে করে নার্সারী । তাদের ফার্মে বর্তমানে আরো ১০ জন শিক্ষিত যুবক কাজ করে। কামাল ও জামাল শুধু নিজেদের বেকার সমস্যারই সমাধান করেনি বরং পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ক. কামাল ও জামাল যে পদ্ধতিতে নিজেদের কাজের ব্যবস্থা করেছে তাকে অর্থনীতিতে কী বলে?
খ. এরূপ কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা বর্ণনা কর।
গ. জামাল ও কামাল এর অভিজ্ঞতার আলোকে তোমার নিজ এলাকার শিক্ষিত বেকারদের স্বকর্মসংস্থানের উপায় ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূর করা সম্ভব"- এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের শিল্প

INDUSTRY OF BANGLADESH

৫.১ বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। কিন্তু এখানকার কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত এবং কৃষি উৎপাদন কম। দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বেকারত্ব বেশি। মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। কেবল কৃষির ওপর ভিত্তি করে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দেশের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কৃষির পাশাপাশি শিল্পের উন্নতি প্রয়োজন। বস্তুত আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলো দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণনা করা হল :

১. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশি সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য। কেবল কৃষির মাধ্যমে এ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ কৃষিতে উৎপাদন ধীর গতিতে চলে এবং নানা সীমাবদ্ধতার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো যায় না। শিল্পে উৎপাদন দ্রুত এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পর্যন্ত বাড়ানো যায়। তাই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। এ জন্য বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল শিল্পোন্নয়ন।

২. জাতীয় আয় বৃদ্ধি : জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেরই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই কেবল কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে কোনো দেশের জাতীয় আয় দ্রুত বাড়ানো যায় না। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত বলে এখানে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। আমাদের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়াতে হলে শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন।

৩. বেকার সমস্যার সমাধান : বাংলাদেশে উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন বেকার সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। কৃষি ক্ষেত্রে বাড়তি জনসংখ্যার চাপের ফলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে। দেশের এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে বাড়তি কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এ অবস্থায় কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রসমূহ বিশেষ করে শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমেই আমাদের বাড়তি জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

৪. কৃষি উন্নয়ন : বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন চাষ ও সেচের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি। এসব উপকরণ উৎপাদনের জন্য শিল্পোন্নয়ন আবশ্যক। দেশেই প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষি উপকরণ উৎপাদিত হলে তার যোগান বাড়বে ও দাম কমবে। এর ফলে কৃষকদের পক্ষে উন্নত কৃষি উপকরণসমূহ ব্যবহার করে সহজেই কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। সুতরাং কৃষি উন্নয়নের জন্য দেশে শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। এ ছাড়া আমাদের বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্যও প্রক্রিয়াজাতকরণ কলকারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন।

৫. কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস : বাংলাদেশের কৃষিতে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপের জন্য জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা বাড়ছে। ফলে কৃষি জোত ক্রমেই ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এ জন্য দেশে আধুনিক ও যান্ত্রিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। এ অবস্থায় কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি অন্য খাতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। দেশে অধিক সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন করেই বাড়তি জনসংখ্যার কর্মসংস্থান এবং জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানো সম্ভব। দেশে শিল্পোন্নয়নের ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদেরও পথ সুগম হবে।

৬. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার : বাংলাদেশে নানা রকম প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এগুলোর সদ্ব্যবহার করা দরকার। তাহলে শিল্প উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয় বাড়বে। তাতে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে।

৭. উৎপাদনে নিশ্চয়তা : বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন কৃষি উৎপাদনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিন্তু শিল্প পণ্যের উৎপাদনে এ ধরনের সমস্যা নেই। তাই আমাদের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য।

৮. অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটলে রপ্তানি বাড়বে ও অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্পের প্রসার ও উন্নতির ফলে আমাদের রপ্তানি আয় অনেক বেড়েছে।

৯. পরনির্ভরতা হ্রাস : বাংলাদেশে বহুবিধ ভোগ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি যানবাহন, কাঁচামাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিদেশ থেকে আমদানি করে। এসব দ্রব্যের আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়ের চেয়ে বেশি। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি হ্রাস করা সম্ভব। তাহলে পরনির্ভরতা কমবে এবং আয় ব্যয়ের ভারসাম্য অনুকূল হবে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো কম পরনির্ভর।

১০. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। তাই যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার। যানবাহন ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দেশেই উৎপাদন করা প্রয়োজন। এ জন্য দেশে শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। এ ছাড়া উন্নত মানের রাস্তাঘাট, সেতু, বন্দর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য লোহা, ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য।

১১. শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : বাংলাদেশে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এ জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, যানবাহন ইত্যাদি প্রয়োজন। যতটা সম্ভব এসব দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প কারখানা গড়ে তোলা আবশ্যক।

১২. নগরায়ণ ও সামাজিক উন্নয়ন : দ্রুত নগরায়ন ও সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের মাধ্যমে নগরায়নের হার বৃদ্ধিও জনসাধারণের জন্য অধিক সামাজিক সুবিধা প্রদান সম্ভব। তাছাড়া জনসাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও শিল্পের উন্নতি একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য।

৫.২ কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ কৃষিখাতের ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ২১ ভাগ কৃষি থেকে আসে এবং শ্রমশক্তির প্রায় ৬৩ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। কিন্তু কৃষি অর্থনীতির বৃহত্তম খাত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি অনুন্নত, প্রকৃতি নির্ভর ও নিম্ন উৎপাদনশীল। পাশাপাশি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সীমিত কৃষি জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বাড়ছে। ফলে কৃষি জোত খন্ড-বিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মাথাপিছু কৃষি উৎপাদন কমছে এবং ছদ্মবেকারত্ব বাড়ছে। তাই বলা যায়, কেবল কৃষি খাতের উন্নতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। এ জন্য কৃষির পাশাপাশি এ দেশের শিল্প খাতেরও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়ন বাংলাদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি, বেকারত্ব হ্রাস এবং জীবনযাত্রার সার্বিক মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। বস্তুত অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প এ উভয় খাত তাদের উন্নয়নের জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিচে আলোচনা করা হলো :

কৃষির ওপর শিল্পের নির্ভরশীলতা

১. কৃষি শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। বাংলাদেশে পাট, চা, চিনি, কাগজ, চামড়া প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে। কাজেই কৃষির ওপর ভিত্তি করে সহজেই এসব শিল্প স্থাপন করা সম্ভব।

২. বাংলাদেশ শিল্পোৎপাদনের জন্য শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে। এ জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করা যায়।

৩. বাংলাদেশে কৃষি খাতের উন্নয়ন হলে কৃষকদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। ফলে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য তাদের চাহিদাও বাড়বে। এর ফলে শিল্প পণ্যের বাজার বিস্তৃত হবে এবং শিল্পের উৎপাদন বাড়বে।

৪. বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি হয়। ঘাটতি পূরণের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্যশস্য আমদানি করতে গিয়ে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি বিঘ্নিত হয়। এতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে খাদ্যশস্য আমদানির দরকার হবে না। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে যা শিল্পোন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে।

৫. বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। আমাদের কৃষি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হলে দেশের জনগণের আয় বাড়বে। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। এর ফলে আমাদের শিল্পে পুঁজির অভাব দুর হবে।

৬. কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়লে কৃষি খাতে শিল্পের যেসব কাঁচামাল উৎপাদিত হয় তার দাম কমবে। এতে দেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ সস্তায় কাঁচামাল ক্রয় করতে পারবে। ফলে শিল্পের উৎপাদন ও মুনাফা বাড়বে। মুনাফা শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে দেশে বেশি করে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ যোগাবে।

শিল্পের ওপর কৃষির নির্ভরশীলতা

১. বাংলাদেশে কৃষির উন্নতি ও আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষি সরঞ্জাম, সার, কীটনাশক প্রভৃতির পর্যাপ্ত যোগান প্রয়োজন। দেশে এসব উপকরণ উৎপাদনকারী শিল্প গড়ে উঠলে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সস্তায় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে। ফলে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

২. কৃষিকাজের জন্য আমাদের কিছু যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি করতে হয়। দেশে শিল্পোন্নয়ন ঘটলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বাড়বে। এর ফলে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হলে তা দিয়ে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ আমদানি করে তা কৃষি উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে।

৩. বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটলে কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা বাড়বে। কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষির উৎপাদন বাড়বে। এর ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

৪. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি লোক নিয়োজিত রয়েছে। এর ফলে কৃষি জোত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ক্রমেই ক্ষুদ্র হয়ে পড়ছে। সাথে সাথে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব সমস্যাও দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির বাড়তি জনশক্তিকে অন্যত্র স্থানান্তর করা প্রয়োজন। একমাত্র শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির বাড়তি জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। কেবল তখনই কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ কমবে।

৫. দেশে শিল্পের প্রসার ঘটলে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এর ফলে একদিকে পণ্যের অপচয়রোধ করা যাবে এবং অন্যদিকে কৃষকদের পণ্যের ন্যায্য দাম প্রাপ্তিতে সাহায্য করা সম্ভব হবে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ দুটি ক্ষেত্রে একই সঙ্গে উন্নতি একান্তভাবে কাম্য।

৫.৩.১ বাংলাদেশের শিল্পের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও এখানে শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের শিল্প ব্যবস্থা উন্নত নয়। বাংলাদেশের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে বর্ণনা করা হল :

১. জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান : বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত। দীর্ঘসময়ের অবহেলার জন্য এ দেশে শিল্প কারখানার তেমন প্রসার ঘটেনি। এ জন্য আমাদের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান মাত্র প্রায় ২৯.৬৬ % ভাগ।

২. শিল্প কাঠামো : বাংলাদেশের শিল্প ক্ষেত্রে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির এ তিন ধরনের শিল্প পাশাপাশি অবস্থান করে।

৩. কৃষিভিত্তিক শিল্প : বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। যেমন, পাট, বস্ত্র, চা, চিনি, কাগজ এবং অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৪. নিম্নমানের কলাকৌশল : আমাদের শিল্প কারখানাগুলোতে উন্নত দেশের তুলনায় নিম্নমানের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এ জন্য আমাদের শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ কম ও মান নিচু।

৫. ভারী ও মৌলিক শিল্পের অভাব : বাংলাদেশে ভারি ও মৌলিক শিল্প নেই বললেই চলে। পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতি সবই ভোগ্যপণ্যের শিল্প।

৬. কুটির শিল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যক লোক বিশেষ করে নারী ও শিশু কুটির শিল্পে নিয়োজিত। অতীতে বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সুনাম ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কুটির শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।

৭. শিল্পের মালিকানা : বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার মালিকানা বিদ্যমান। পাট, বস্ত্র ও অন্য দুএকটি বৃহৎ শিল্পের কিছুসংখ্যক কারখানা সরকারি এবং কিছু কারখানা বেসরকারি মালিকানায় চালু রয়েছে। প্রায় সব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

৮. রপ্তানিমুখী শিল্পের অভাব : বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের অভাব রয়েছে। প্রধানত পাট ও তৈরী পোশাক শিল্প ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব শিল্পই অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য উৎপাদন করে।

৯. রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা : দেশে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং শিল্পক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কয়েকটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (Export Processing Zone–EPZ) স্থাপন করা হয়েছে। এ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোকে মোটামুটিভাবে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৫.৩.২ বাংলাদেশে শিল্পের অনুন্নয়নের কারণ

বাংলাদেশে শিল্পে অনুন্নত। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও পর্যাপ্ত জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও এ দেশে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। আমাদের শিল্পের অনুন্নয়নের কারণগুলো হল :

১. ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনের অবহেলা : প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবহেলায় এ দেশে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশরা এ অঞ্চলকে কাঁচামাল উৎপাদনকারী ও শিল্প পণ্যের বাজার রূপে ব্যবহার করত। প্রায় চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি আমলেও শাসকদের বৈষম্যমূলক শাসন নীতির ফলে এখানে শিল্পের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটেনি।

২. স্বাধীনতা পরবর্তী শিল্পের অবস্থা : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে শিল্পখাতের প্রায় ৯২ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং ২৫ লক্ষ টাকার বেশি মূলধনের শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ক্রমে বেসরকারিকরণ কর্মসূচি গৃহীত হলেও শিল্প স্থাপনে অসংখ্য বিধি নিষেধ ও অনুমতি সংগ্রহের জটিলতা শিল্পোন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৩. পুঁজির স্বল্পতা : শিল্প স্থাপনের জন্য পুঁজি দরকার। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ বলেই এখানে আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে এখানে পুঁজি গঠনের হারও কম। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে এ দেশে উদ্যোক্তারা সহজে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারে না।

৪. খনিজ ও শক্তি সম্পদের অভাব : বাংলাদেশে কয়লা, তেল, লোহা প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অভাবে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়। তাছাড়া শিল্প কারখানার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির অভাব রয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস পর্যাপ্ত হলেও শিল্পের কাঁচামাল রূপে ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি।

৫. কারিগরি জ্ঞানের অভাব : আধুনিক শিল্পের জন্য উন্নত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শিল্প শ্রমিকের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিক আধুনিক কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন নয়। এ জন্য শিল্প কারখানার দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয় না।

৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব : কলকারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ শ্রমিক একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত জনশক্তি থাকলেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে শ্রমিকের দক্ষতা কম। অদক্ষ শ্রমিকের জন্য এ দেশে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়।

৭. উদ্যোক্তার অভাব : শিল্পোন্নয়নের জন্য দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের সুদীর্ঘসময়ে এ দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি হয়নি। এবং এখনো এ দেশে কলকারখানা স্থাপনের জন্য আগ্রহী উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। এ কারণে আমাদের শিল্পের উন্নতি প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না।

৮. শিল্প ঋণের সমস্যা : শিল্প স্থাপনের জন্য ঋণের দরকার হয়। বাংলাদেশে সহজে ও প্রয়োজনমতো শিল্পে বিনিয়োগের জন্য ঋণ পাওয়া যায় না। বৈদেশিক ঋণও পর্যাপ্ত নয়। তাই ঋণের অভাবে এ দেশে শিল্পের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

৯. বৈদেশিক মুদ্রার অভাব : শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল প্রভৃতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এসব উপকরণ প্রয়োজন মাফিক আমদানি করা যায় না। ফলে শিল্প কারখানা স্থাপনে অসুবিধা হয়।

১০. অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয়। এ জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবহন এবং শ্রমিকের চলাচল বিঘ্নিত হয়।

১১. দক্ষ পরিচালকের অভাব : শিল্প কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরিচালকের একান্ত প্রয়োজন। দেশে এ ধরনের পরিচালকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ কারণেই স্বাধীনতা উত্তরকালে এ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নানা সমস্যা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন শিল্প লোকসানের সম্মুখীন হয়।

১২. শিল্পনীতি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অভাব : শিল্প কারখানা ভালোভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি থাকা প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে শিল্পনীতি প্রণীত হলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের গতি অনেকাংশে মনথর।

১৩. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিকের অসন্তোষের কারণে প্রায়ই ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও প্রভৃতি ঘটে। ফলে শিল্প উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত হয়।

১৪. অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব : বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনের আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

যেমন, শিল্প এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় জমি, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, কাঁচামাল ও সরঞ্জাম আমদানির ব্যবস্থা এবং প্রত্যক্ষ সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা প্রভৃতি সুবিধার অভাব রয়েছে। এ কারণে শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ ব্যাহত হয়। এসব কারণে বাংলাদেশ এখনো শিল্পে অনুন্নত।

৫.৩.৩ বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের উপায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পোন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন :

১. বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ : বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বেসরকারি খাতই দক্ষ ও গতিশীল। বাংলাদেশে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত লোকসান দিচ্ছে তখন বেসরকারি উদ্যোগে পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নিজ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। অতএব বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য বেসরকারি উদ্যোগকে সর্বপ্রকার উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

২. সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা : শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপন করা যায় না এমন কিছু বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সরকারি মালিকানায় গড়ে তুলতে হবে। অন্যান্য সব শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের প্রতি সক্রিয় সরকারি সহযোগিতা প্রদান করা দরকার। বর্তমানে দেশে বেসরকারি ও বিদেশি উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৩. শিল্প পুঁজির যোগান বৃদ্ধি : বাংলাদেশে পুঁজির স্বল্পতার জন্য শিল্প স্থাপন সম্ভব হয় না। এ জন্য দেশে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন বাড়াতে হবে। শিল্প ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশ থেকেও সহজশর্তে শিল্প ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব শিল্পে অতিদ্রুত উৎপাদন সম্ভব সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করা দরকার।

৪. খনিজ ও শক্তি সম্পদের উন্নয়ন : বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য ও শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহের ওপর শিল্পোন্নয়নের গতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাই দেশে যাতে ভবিষ্যতে শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত হয় সে জন্য এখন থেকে জ্বালানি তেল, কয়লা, চুনাপাথর, গ্যাস প্রভৃতি সম্পদের অনুসন্ধান ও বিদ্যুৎসহ শক্তিসম্পদের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা দরকার।

৫. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তাই আমাদের রেলপথ, সড়কপথ, জলপথ, ও বিমানপথ এবং যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলোর আরো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তাহলে শিল্পের কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য ও শ্রমিকের পরিবহন সহজ হবে। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কলকারখানা গড়ে উঠবে।

৬. কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষ শ্রমিক : দেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্পের জন্য উন্নত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে হবে। তাহলে শিল্প কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস পাবে। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্য গুণে ও মানে সমৃদ্ধ হবে।

৭. কৃষি উন্নয়ন : বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নতি করতে হবে। কারণ কৃষির উন্নয়ন সাধিত হলে শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্য হবে। তাছাড়া কৃষকের আয় বাড়লে তার ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। ফলে শিল্পপণ্যের বাজার বিস্তৃত হবে।

৮. শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি : শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রশস্ত হওয়া দরকার। এ জন্য বাংলাদেশের শিল্পপণ্যের বৈদেশিক বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হলে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে।

৯. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : দেশে শান্তি শৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে শিল্পোন্নয়ন দ্রুত হয়। তাই শিল্প কারখানার অব্যাহত উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সাথে সাথে শ্রমিক অসন্তোষও দূর করতে হবে।

১০. সুষ্ঠু করনীতি প্রণয়ন : দেশে বিদ্যমান কর ব্যবস্থা শিল্পোন্নয়নকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য যথাযথ করনীতি প্রণীত হওয়া দরকার। তাছাড়া বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সৃষ্টিতেও কর ব্যবস্থা যাতে ভূমিকা পালন করতে পারে তা দেখা প্রয়োজন।

১১. দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন : যেসব শিল্পে দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার করা যায় সে ধরনের শিল্প প্রথমে স্থাপন করা উচিত। যেমন পাট, চা, চামড়া, কাগজ, চিনি, সার প্রভৃতি শিল্পে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। এ জন্য দেশে এসব শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

১২. রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন : যেসব শিল্পপণ্যের চাহিদা বৈদেশিক বাজারে বেশি সেসব শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। এতে একদিকে দেশে শিল্প খাতে প্রসার ঘটবে, অন্যদিকে রপ্তানি আয় বাড়বে। এ দিক থেকে এ দেশে তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, সার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চামড়া প্রভৃতি শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে।

১৩. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে বেশি গুরুত্ব : বড় শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পে কম পুঁজি ও বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা যায়। তাই আমাদের মতো স্বল্প পুঁজির ও উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশে বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। এতে বেকার সমস্যা দূর হবে এবং পুঁজির অভাবে শিল্পোন্নয়ন বিঘ্নিত হবে না।

১৪. অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এর বিনিময়ে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি করা যাবে।

১৫. ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠা : দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনকারী ভারি শিল্প থাকা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৬. শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা : শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশে শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা উৎসাহিত করতে হবে। কৃষিভিত্তিক ও রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন শিল্প কারখানার লোকসান হ্রাস, পণ্যের মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করলে পরিণামে তা দেশে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করবে।

১৭. শিল্পনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন : শিল্পনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ ও পরিবেশ রয়েছে। তবে এ জন্য দরকার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কার্যকর শিল্পনীতির সফল বাস্তবায়ন।

৫.৪.১ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধানত তিন ধরনের শিল্প রয়েছে। যথা, ক. বৃহদায়তন শিল্প, খ. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও গ. কুটির শিল্প।

ক. বৃহদায়তন শিল্প :

যেসব শিল্প কারখানায় বেশি মূলধন ও কাঁচামাল এবং বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে বৃহদায়তন শিল্প বলে। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি এবং বেশি মাত্রায় মূলধন ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রধান প্রধান বৃহৎ শিল্প হল পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি।

খ. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প :

যেসব শিল্প কারখানায় বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কম মূলধন এবং মূলধনের তুলনায় বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় সাধারণভাবে সেসব শিল্পকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। প্লাস্টিক ও নাইলন শিল্প, সাবান, প্রসাধনী, চামড়া, কাঁচ, দিয়াশলাই, চীনামাটি ও এলুমিনিয়াম সামগ্রী প্রভৃতি দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রেণীভুক্ত। আমাদের জনগণের ভোগ্যপণ্যের বেশিরভাগ চাহিদা এই শিল্পগুলো পূরণ করে।

গ. কুটির শিল্প :

বাংলাদেশে যেসব শিল্প সাধারণত স্বল্প মূলধন, সহজলভ্য কাঁচামাল ও অল্প সংখ্যক শ্রমিক দ্বারা নিতান্ত পারিবারিক পরিবেশে পরিচালিত হয় তাকে কুটির শিল্প বলে। এরূপ শিল্পের স্বল্প মূলধন ও অল্প সংখ্যক শ্রমিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের সদস্যগণ সরবরাহ করে। এসব শিল্পে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় না এবং উৎপাদন কলাকৌশল মান্ধাতা আমলের। এককালে বাংলাদেশের কুটির শিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এ দেশের উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পগুলো হল হস্ত চালিত তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, বিড়ি শিল্প, কাঁসা ও পিতল শিল্প, শঙ্খ ও ঝিনুক শিল্প প্রভৃতি।

৫.৪.২ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বৃহদায়তন শিল্প

নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বৃহদায়তন শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১. পাট শিল্প : পাট শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এ দেশে প্রায় ১০.৩৪ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করা হয়। বার্ষিক কাঁচা পাটের উৎপাদন প্রায় ৪৮.৮৪ লক্ষ মে. টন। এটা পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭৫ ভাগ। আমাদের পাট শিল্পে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ হলেও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কোনো পাট কল ছিল না। অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত ১০৮টি পাটকলের সবগুলোই ভারতের ভাগে পড়ে। ১৯৫১ সালে এ দেশের প্রথম পাটকল আদমজী জুট মিল নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭৮টি পাটকল রয়েছে। এর মধ্যে আদমজী জুট মিলের কার্যক্রম বন্ধ। উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাটকলগুলোর উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চট, চটের বস্তা, কার্পেট, ত্রিপল, জায়নামাজ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪.৫০ লক্ষ মে. টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৯৯২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। [১]

২. বস্ত্র শিল্প : বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৯টি কাপড়ের কল ছিল। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশে বস্ত্র ও সুতা কলের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪টি। বর্তমানে এ দেশে মোট ৬৩টি বস্ত্র ও সুতা কল আছে। বস্ত্র ও সুতা উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে বছরে প্রায় ১৪০ কোটি মিটার কাপড়ের প্রয়োজন। কিন্তু এ দেশের কাপড় ও সুতা কলগুলোতে বছরে মাত্র প্রায় ১২ কোটি মিটার কাপড় এবং ১৪ কোটি পাউন্ড সুতা উৎপাদিত হয়। সুতরাং কাপড়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কাপড় ও সুতা আমদানি করতে হয়। কাপড় ও সুতা কলগুলো প্রধানত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। আমাদের বস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যা হল কাঁচা তুলার অভাব। বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে একদিকে কাঁচা তুলার উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং অন্যদিকে আরো বেশি সংখ্যক কাপড় ও সুতা কল স্থাপন করতে হবে।

৩. চিনি শিল্প : ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫টি চিনিরকল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা মোট ১৭টি। এগুলো সরকারি মালিকানায় পরিচালিত। এ চিনিকলগুলো প্রধানত রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও. সেতাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নাটোর, কুষ্টিয়া, দর্শনা ও ফরিদপুরে অবস্থিত। এটি একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে চিনির প্রয়োজন প্রায় ৩ লক্ষ মে. টন। কিন্তু আমাদের চিনিকলগুলোর বার্ষিক মোট উৎপাদন ১ লক্ষ মে. টনের কিছু বেশি। সুতরাং চিনি উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আখের উৎপাদন বৃদ্ধি, চিনিকলগুলোর সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এবং নতুন চিনিকল স্থাপনের মাধ্যমে এ দেশে চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চিনি রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। ২০০৫-০৬ সালে মোট প্রায় ১.৩৩ লক্ষ মে. টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। [২]

---

১. উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ- ১৯৯৩-৯৪

২. উৎস : বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক - ২০০৭

৪. কাগজ শিল্প : ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কোনো কাগজের কল ছিল না। ১৯৫৩ সালে দেশের প্রথম কাগজের কল 'কর্ণফুলী পেপার মিল' পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ সালে পাকশীতে স্থাপিত হয় 'নর্থবেঙ্গাল পেপার মিল'। এ ছাড়া খুলনায় একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় একটি করে হার্ডবোর্ড মিল রয়েছে। সিলেটের ছাতকে একটি কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কাগজের কলগুলোতে প্রধানত বাঁশ, নরম কাঠ, আখের ছোবড়া প্রভৃতি কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দেশের সবগুলো কাগজের কল সরকারি খাতে পরিচালিত।

কাগজ উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশীয় চাহিদা পূরণের পর এ দেশ থেকে কিছু পরিমাণ কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে কাগজ ও নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৪৪ হাজার মে. টন ও ৬ হাজার মে. টন। [৩]

৫. সার শিল্প : কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি সার কারখানা রয়েছে। এগুলো হল ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, চট্টগ্রাম টিএসপি সার কারখানা, খুলনা টিএসপি সার কারখানা, সিলেট অ্যামোনিয়া সালফেট কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা এবং জামালপুরের যমুনা সার কারখানা। এই সার কারখানাগুলো সরকারি মালিকানাধীন। বাংলাদেশ সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে সারের উৎপাদন ছিল ইউরিয়া ২১ লক্ষ ৩৯ হাজার মে. টন, টিএসপি ৫৯ হাজার মে. টন ও অ্যামোনিয়া সালফেট ৭ হাজার মে. টন। [৪]

৬. সিমেন্ট শিল্প : স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশে মাত্র ১টি সিমেন্ট কারখানা ছিল সিলেটের ছাতকে। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামে একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া জয়পুরহাটে আর একটি সিমেন্ট কারখানা নির্মাণের কাজ চলছে। এই সিমেন্ট কারখানাগুলো সরকারি খাতে পরিচালিত। বর্তমানে বাংলাদেশে সিমেন্টের অভ্যন্তরীণ বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১০ লক্ষ মে. টন। কিন্তু আমাদের মোট বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩ লক্ষ মে. টনের মত। ১৯৯২-৯৩ সালে এ দেশে ২.০৭ লক্ষ মে. টন সিমেন্ট উৎপাদন হয়েছে। [৫]

৭. লোহা ও ইস্পাত শিল্প : বাংলাদেশের একমাত্র লোহা ও ইস্পাত কারখানা চট্টগ্রামে স্থাপিত হয় ১৯৬৭ সালে। এর বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.৫ লক্ষ টন। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা এ কারখানায় ইস্পাত সীট, লোহার পাত, রড, ঢেউটিন এবং লোহা ও ইস্পাতের অন্যান্য দ্রব্য তৈরি হয়। এসব দ্রব্যের উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম।

৮. ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প : ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মোটেই উন্নত নয়। গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে একটি মেশিন টুলস কারখানা রয়েছে। এ কারখানায় পানি সেচের পাম্প ও মেশিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। ঢাকার অদূরে টঙ্গিতে একটি ডিজেল প্লান্ট এবং গাজীপুরে দেশের একমাত্র অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রামে একটি বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল তৈরির কারখানা এবং পতেঙ্গায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি তৈরির আর একটি কারখানা নির্মিত হয়েছে।

৯. জাহাজ নির্মাণ শিল্প : ১৯৫৭ সালে খুলনায় একটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। সেখানে জাহাজ মেরামত ছাড়াও বার্জ, লঞ্চ, টাগ প্রভৃতি জলযান এবং চিনি কলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। নারায়ণগঞ্জ ডক ইয়ার্ডে অভ্যন্তরীণ নৌপথের জাহাজ ও লঞ্চ নির্মাণ এবং মেরামত করা হয়। চট্টগ্রামে অবস্থিত ড্রাইডকে সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামত করা হয়।

১০. পোশাক শিল্প : বর্তমানে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প দ্রুত বিকশিত একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। ১৯৭৬ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকার তৈরী পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে এই শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। মাত্র ৩১ বছরে আমাদের পোশাক শিল্প অকল্পনীয় উন্নতি করেছে।

---

৩. উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ- ১৯৯৩-৯৪

৪. উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ- ১৯৯৩-৯৪

৫. উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ- ১৯৯৩-৯৪

বর্তমানে দেশে প্রায় ৪৬০০ পোশাক তৈরির কারখানা আছে। এসব কারখানায় তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বড় বড় ক্রেতা হল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ। আমাদের দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৫ ভাগই আসে তৈরী পোশাক রপ্তানি থেকে। এ শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ যার প্রায় ৮৫% মহিলা। এ শিল্পে ব্যবহৃত কাপড়ের প্রায় সবই বিদেশ থেকে আসে। ২০০৬-০৭ সালে আমাদের তৈরী পোশাকের রপ্তানি আয় ছিল ৬৩৩৪৩০ মিলিয়ন টাকা।

৫.৪.৩ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ

নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

১. প্লাস্টিক ও নাইলন শিল্প : এই শিল্পে বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর ছোট ছোট ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ রকম অনেক কারখানা রয়েছে।

২. বস্ত্র সংক্রান্ত শিল্প : ছোট ছোট কাপড়ের কারখানায় চাদর, পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য রেশম বস্ত্র প্রভৃতি তৈরি হয়। ঢাকা, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে এ শিল্পের অনেক কারখানা রয়েছে।

৩. প্রসাধনী ও সাবান শিল্প : দেশে সাবান, তেল, পাউডার, ক্রিম, টুথপেস্ট, চুড়ি ও অন্যান্য নানা প্রকার প্রসাধনী দ্রব্য তৈরির অনেক কারখানা রয়েছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে এসব প্রসাধনী দ্রব্য তৈরির কারখানা অবস্থিত।

৪. চামড়া শিল্প : চামড়ার ব্যাগ, সুটকেস, জুতা, স্যান্ডেল, মানিব্যাগ, বেল্ট প্রভৃতি দ্রব্য আমাদের চাহিদা পূরণ করে। ঢাকার হাজারীবাগ ও দেশের অন্যান্য স্থানে এ শিল্পের কারখানা রয়েছে।

৫. চীনামাটি ও এলুমিনিয়াম শিল্প : বাংলাদেশে চীনামাটির বাসনপত্র, পেয়ালা, ফুলদানি প্রভৃতি এবং এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল, বাসন ইত্যাদি তৈরির অসংখ্য কারখানা আছে।

৬. দিয়াশলাই শিল্প : ঢাকা ও বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দিয়াশলাই তৈরির কারখানা আছে। শিমুল, কদম, ছাতিয়ান কাঠ এ শিল্পের কাঁচামাল।

৭. কাঠ শিল্প : কাঠের কারখানাগুলোতে নানা ধরনের আসবাবপত্র যেমন হার্ডবোর্ড, প্লাইউড এবং অন্যান্য কাঠের আসবাবপত্র তৈরি হয়। দেশের সর্বত্র কাঠের ছোট বড় কারখানা রয়েছে।

৮. খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প : ডেয়ারি ফার্ম, ফলমূল ও মাছ মাংস সংরক্ষণ, চাল ও আটার কল, বেকারি তৈরি খাবার প্রভৃতি এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

৯. লোহা ও ইস্পাত সংক্রান্ত শিল্প : দেশে লেদ কারখানা, ছোটখাট যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি, তালা চাবি, লোহা ও ইস্পাত জাতীয় অসংখ্য বস্তু তৈরী ও মেরামতের বহু কারখানা রয়েছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশে বহুবিধ ছোটখাট ভোগ্যপণ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা আছে। এই ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলো প্রথমত জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের চাহিদা মেটায়। দ্বিতীয়ত এগুলোর মধ্যে কতিপয় শিল্প বৃহৎ শিল্পের অনুপূরক হিসেবে কাজ করে। এ শিল্পগুলোর অধিকাংশই দেশের সহজলভ্য কাঁচামাল ব্যবহার করে। এ ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প এলাকা গঠন করা হয়েছে। এর ফলে দেশে শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার সম্প্রসারণ লক্ষ করা যাচ্ছে।

৫.৪.৪ বাংলাদেশের কুটির শিল্প

একসময় বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সুনাম ছিল। কিন্তু কালক্রমে দেশের বৃহৎ শিল্পের সাথে অসম প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে আমাদের কুটির শিল্পগুলো টিকে থাকতে পারছে না। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখন বেশ কিছু সংখ্যক শিল্প আছে। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১. হস্তচালিত তাঁত শিল্প : এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান কুটির শিল্প। অতীতে ঢাকার মসলিন শাড়ির বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি ছিল। বর্তমানে এ শিল্পের কারখানাগুলোতে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, গামছা, চাদর, মশারি, তোয়ালে, কাতান ও জামদানি শাড়ি ইত্যাদি তৈরি হয়। টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, ঢাকা, পাবনা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থান তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪.৫০ লক্ষ হস্তচালিত তাঁত রয়েছে। এসব তাঁতে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। আমাদের দেশের মোট কাপড়ের চাহিদার বেশিরভাগই তাঁত শিল্প মিটিয়ে থাকে।

২. মৃৎ শিল্প : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কুমারেরা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, কলস, বাসন, টব, ফুলদানি, মূর্তি, খেলনা প্রভৃতি দ্রব্য তৈরি করে। এ শিল্প দেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন বহন করে। এ শিল্পে মূলধন লাগে খুব কম। বাংলাদেশের পাবনা ও ফরিদপুর জেলা মৃৎ শিল্পে সুনাম অর্জন করেছে।

৩. বাঁশ ও বেত শিল্প : বাঁশ ও বেত থেকে তৈরি মোড়া, সোফা সেট, সুটকেস, ঝুড়ি, কুলা, ফুলদানি, পাটি, মাদুর, হাতব্যাগ, দোলনা ইত্যাদি এ শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য। সিলেট, কুমিল্লা, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে এ শিল্পের উন্নতমানের দ্রব্য তৈরি হয়।

৪. রেশম শিল্প : বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, পাবনায় রেশম চাষের কেন্দ্র আছে। রেশম থেকে শাড়ি, চাদর, থান কাপড় তৈরি হয়। রাজশাহী সিল্ক শাড়ি খুব জনপ্রিয়। রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজশাহীতে একটি পৃথক 'সেরিকালচার বোর্ড' আছে।

৫. কাঁসা ও পিতল শিল্প : রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কাঁসা ও পিতলের থালাবাসন, কলস, চামচ, ঘটিবাটি, ফুলদানি তৈরি হয়। কাঁসা পিতলের তৈরি এসব সামগ্রী এ দেশে কিছুকাল আগেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

৬. বিড়ি শিল্প : দেশের প্রায় সর্বত্র বিড়ির কারখানা থাকলেও রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। দেশে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। সিগারেট শিল্পের প্রসারের ফলে বিড়ি তৈরি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে।

৭. শঙ্খ ও ঝিনুক শিল্প : বাংলাদেশের ঢাকা, যশোর ও রংপুর জেলা এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এসব স্থানে শঙ্খ, ঝিনুক, হাতির দাঁত ও হাড় থেকে শাঁখা, মালা, বোতাম, বালা, চিরুনি, খেলনা ইত্যাদি জিনিস তৈরি হয়।

৮. ধাতব শিল্প : দেশের সর্বত্র কামারেরা ধাতব পদার্থ থেকে কোদাল, কুড়াল, ছুরি, কাঁচি, বটি, লাঙলের ফলা, নিড়ানি প্রভৃতি জিনিস তৈরি করে।

৯. ছোবড়া শিল্প : নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ, ব্রাশ, জাজিম প্রভৃতি তৈরি হয়। খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

১০. চরকা শিল্প : বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় চরকায় কাটা সুতার দ্বারা খদ্দরের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে এ ধরনের খদ্দরের কাপড়, চাদর ও তৈরী পোশাক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

১১. পাট নির্ভর কুটির শিল্প : বাংলাদেশের কুটির শিল্পে কাঁচা পাট থেকে দড়ি, সিকা, থলে ও গৃহসজ্জার বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয়। দেশের ভেতরে ও বাইরে এসব দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে।

১২. অলংকার শিল্প : দেশের গ্রাম ও শহরের সব স্থানেই অলংকার শিল্প গড়ে উঠেছে। এ শিল্পে স্বর্ণকারেরা সোনা ও রূপা দিয়ে নানা ধরনের অলংকার তৈরি করে। এ শিল্প দিন দিন প্রসার লাভ করছে।

১৩. কাঠ শিল্প : বাংলাদেশের সর্বত্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে কাঠের ছোটখাটো আসবাবপত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী, লাঠি, লাঙল, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি জিনিস তৈরি হয়। দেশের সব স্থানেই এসব দ্রব্যের চাহিদা আছে।

১৪. সাবান শিল্প : ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে কুটির শিল্পে সাধারণ মানের কাপড় কাচা সাবান উৎপন্ন হয়।

১৫. লবণ শিল্প : বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে সমুদ্রের লোনা পানি থেকে লবণ তৈরি হয়। এভাবে দেশে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়।

১৬. অন্যান্য কুটির শিল্প : চামড়ার ছোট ছোট গৃহস্থালি দ্রব্য তৈরি, বই বাঁধাই, তেলের ঘানি, ঢেকি, মিষ্টি দই ও ঘি তৈরি ইত্যাদি নানা প্রকার কুটির শিল্প আমাদের অসংখ্য ভোগ্য পণ্যের চাহিদা মেটায়।

৫.৫ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশে কৃষি জমি সীমিত এবং বৃহৎ শিল্প অনুন্নত। তাই দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। জাপানের মতো উন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান অধিক। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব নিচে বর্ণনা করা হল :

১. বেকার সমস্যা লাঘব : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রমশক্তি বেকার। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ঘটলে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে। চাষিদের জন্য সহকারি পেশা এবং অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান : বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। এ বিপুল সংখ্যক নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা দরকার। কুটির শিল্পের প্রসার ঘটলে মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পরিবারের আয় বাড়বে।

৩. কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। তাহলে কৃষির ওপর যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ রয়েছে তা এসব শিল্পে স্থানান্তরিত হবে।

৪. দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার : বাংলাদেশে পাট, চা, চামড়া, বাঁশ, বেত, কাঠ এবং অন্যান্য বহুবিধ কাঁচামাল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এসবের সদ্ব্যবহার হলে দেশের উৎপাদন ও আয় বাড়বে।

৫. গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ : বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য সেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বেশি সংখ্যক কারখানা স্থাপন করা দরকার। তাহলে গ্রামীণ জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

৬. মূলধনের সমস্যা লাঘব : বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় বেশ কম। ফলে এ দেশের ভারি শিল্পে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই এখানে স্বল্প মূলধননির্ভর কুটির শিল্পের উন্নয়নই বেশি সুবিধাজনক।

৭. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বড় বড় যন্ত্রপাতি ও বিদেশি কাঁচামাল আমদানি করতে হয় না। ফলে আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়ে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যায়।

৮. বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক : যেসব দ্রব্য বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন করা সম্ভব নয় সেগুলো কুটির শিল্পে উৎপাদিত হয়। সুতরাং কুটির শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

৯. সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পগুলো শহরাঞ্চলে স্থাপিত হওয়ায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রধানত শহর কেন্দ্রিক। দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।

১০. সম্পদের সুষম বণ্টন : দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটলে স্বল্প আয়ের লোকেরা শিল্প কারখানা স্থাপনে অংশীদার হতে পারে। এতে দরিদ্র লোকের আয় বাড়বে এবং সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন হবে।

১১. জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলার সংরক্ষণ : বাংলাদেশের জনগণের পুরনো ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা রয়েছে। বহুকাল থেকে বিরাজমান কুটির শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলা রক্ষা করা সম্ভব।

সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। তবে দেশের সার্বিক শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

৫.৬.১ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থান

জীবিকা অর্জনের জন্য নিজের উদ্যোগে কাজের ব্যবস্থা করাই হল স্বকর্মসংস্থান। বাংলাদেশে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প কারখানাগুলোতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রমশক্তি বেকার। প্রকট বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এ দেশে সাম্প্রতিককালে স্বকর্মসংস্থানকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত অনেক নারী-পুরুষ বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থানের জন্য এগিয়ে আসছে। এ দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মস্থানের সুযোগ সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

ক্ষুদ্র শিল্পে স্বকর্মসংস্থান :

অল্প জায়গা ও সামান্য পুঁজি সংগ্রহ করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনমুখী কাজ শুরু করা যায়। যেমন, সাধারণ মানের পোশাক ও হোসিয়ারি দ্রব্য, রেশমের শাড়ি ও কাপড় তৈরির কারখানা, চাল ও আটা কল, কাপড় কাচা সাবান, বেকারি, ফাস্ট ফুডের দোকান, আসবাবপত্র তৈরির কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করা যায়। এ ছাড়া নানা প্রকার প্রসাধনী দ্রব্য, যেমন মাথার তেল, পাউডার, স্নো, লেখার কালি, বলপেন, আঠা, ছোট ছোট প্লাস্টিক সামগ্রী ইত্যাদি তৈরির কাজ নিজের বাড়িতে করা যায়। এসবের জন্য দেশজ কাঁচামাল এবং স্বল্পমূল্যের কিছু সরঞ্জামাদির দরকার হয়। এসব উৎপাদনমূলক উদ্যোগে নিজের কাজের সাথে সাথে সমাজের আরো কিছু লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা পরিচালিত হলে এসব ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র কালক্রমে বড় আকারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থান :

বাংলাদেশের প্রায় সব কুটির শিল্পই স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত। শহর ও গ্রামের বেকার লোক নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিভিন্ন কুটির শিল্পের কারখানা করতে পারে। যেমন, তাঁতের শাড়ি, লুঙ্গি, চাদর, মশারি, গামছা প্রভৃতি জিনিস দেশের বিভিন্ন স্থানে স্ব-উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া মাটির সামগ্রী, বাঁশ, বেত ও কাঠের জিনিস, কাঁসা, পিতলের বাসন কোসন, নারকেলের ছোবড়ার সামগ্রী, মাদুর, বিড়ি, সুচি শিল্প ইত্যাদি কুটির শিল্পের কাজ নিজ উদ্যোগে সহজেই শুরু করা যায়। এসব কর্মকাণ্ডে সামান্য পুঁজি মামুলি ধরনের যন্ত্রপাতি হলেই চলে। কাঁচামালও সহজলভ্য। দেশে এসব দ্রব্যের ব্যাপক বাজার রয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এসব কাজের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান করে আয় বাড়াতে পারে। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসব ছোট ছোট উদ্যোগে ঋণ দান করে পুঁজির চাহিদা পূরণ করে। আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র এসব কুটির শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগ ক্রমশ বাড়ছে।

নিজ উদ্যোগে কাজের সংস্থানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা সম্ভব। এ জন্যই এ ধরনের প্রচেস্টাকে দেশে বিদেশে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাই একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের শ্রম ও মেধার সদ্ব্যবহার করা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প ও তৈরী পোশাক শিল্পের প্রধান সমস্যা ?

ক. দক্ষ শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা খ. মূলধনের অপ্রাচুর্যতা

গ. কাঁচামালের অভাব ঘ. রপ্তানি বাজারের স্বল্পতা

২। বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত মূলত :

ক. রপ্তানি বৃদ্ধি খ. দ্রুত শিল্পায়ন
গ. কৃষি উন্নয়ন ঘ. বাড়িঘর তৈরি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব চৌধুরী একজন গার্মেন্টস মালিক। তিনি তাঁর গার্মেন্টসে প্রায় ৪০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। তাঁর গার্মেন্টসের কাপড় বেশিরভাগ বিদেশি। তাঁর শ্রমিকের মধ্যে ৮০% মহিলা। তিনি তাঁর উৎপাদিত পোষাক যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রপ্তানি করে থাকেন।

৩। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক সাধারণত বেশি ক্রয় করে-

ক. ভারত ও পাকিস্তান খ. সৌদি আরব ও জাপান
গ. যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশসমূহ ঘ. নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ

৪। জনাব চৌধুরী মনে করেন গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজন-

i. শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা
ii. রপ্তানি বাজার প্রসারিত করা
iii. কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. iii ঘ. i, ii এবং iii

৫। বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। এই শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য-

i. কাঁচা তুলার উৎপাদন বাড়াতে হবে
ii. অধিক সংখ্যক বস্ত্রকল স্থাপন করতে হবে
iii. অধিক সংখ্যক সুতাকল স্থাপন করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৬। কুটির শিল্পের পণ্যসমূহ প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকার কারণ -

i. কুটির শিল্পের পণ্যের চাহিদা কম বলে
ii. বৃহদায়তন শিল্পের পণ্যের গুণগত মান উন্নত বলে
iii. কুটির শিল্পের পণ্যের স্থায়িত্ব কম বলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৭। নিচের কোন দ্রব্যটি কুটির শিল্পজাত দ্রব্য ?

ক. বালিশ খ. সার
গ. দিয়াশলাই ঘ. সাবান

৮। তোমার মতে বর্তমানে বাংলাদেশের পাট শিল্পের খারাপ অবস্থার কারণ হতে পারে -

i. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

ii. রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

iii. উন্নত অবকাঠামোর অভাব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির পাশাপাশি শিল্পেরও উন্নয়ন হওয়া অপরিহার্য। দুঃখজনক হলেও এটি সত্য যে, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও বাংলাদেশ শিল্পখাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প অধিক হারে প্রতিষ্ঠা করে অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করা সম্ভব হতে পারে।

ক. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন খাতের উন্নয়ন বেশি হওয়া প্রয়োজন ?

খ. স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্পের উন্নয়ন না হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন কীভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২। বাংলাদেশ সরকার বস্ত্র শিল্প, কৃষিনির্ভর শিল্প, কম্পিউটার সফটওয়্যার, চামড়ার ব্যাগ, জুয়েলারি সামগ্রী ইত্যাদির জন্য ঋণের সুদের হার শতকরা ৯% নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প, কৃষিনির্ভর শিল্প, কম্পিউটার সফটওয়্যার, চামড়ার সামগ্রী তৈরী, অলংকার তৈরী শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেছে। এ সমস্ত শিল্প কারখানার কোনোটি বৃহদায়তন শিল্প, কোনোটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কোনোটি কুটির শিল্প। এ দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হলে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিতদের স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে ।

ক. বস্ত্র শিল্প কোন ধরনের শিল্প ?

খ. উপরে উল্লিখিত একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বর্ণনা দাও।

গ. বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্প বিকাশের উপায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে উপরের বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাজার

৬.১.১ বাজার

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটির অর্থ ভিন্ন। অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটি পণ্য তার ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়বিক্রয় হওয়াকে বোঝায়। যেমন, পাটের বাজার, চালের বাজার, গমের বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি। পাটের বাজার বলতে পাট বিক্রয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে নয়, বরং এক বা একাধিক স্থানে ছড়িয়ে থাকা পাটের ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে পাটের ক্রয়বিক্রয়কে বোঝায়। বাজারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ফরাসি অর্থনীতিবিদ কর্নুট (Cournot) বলেন, "বাজার শব্দ দ্বারা অর্থনীতিবিদগণ দ্রব্যসমাগ্রী ক্রয় বিক্রয়েরকোনো বিশেষ স্থানকে বোঝান না। বরং যে কোনো সমগ্র অঞ্চলকে বোঝান যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা পরস্পরের মধ্যে এমন অবাধ আদান প্রদান করে যাতে দ্রব্যের দাম সহজে এবং দ্রুততার সঙ্গে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।"[১] বাজারের কয়েকটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হল :

১. ক্রয় বিক্রয়যোগ্য একটি বা একাধিক দ্রব্য।

২. দ্রব্যটির একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা।

৩. দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয়ের এক বা একাধিক অঞ্চল।

৪. ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব।

৬.১.২ বাজারের শ্রেণীবিভাগ

অঞ্চল, সময়ের ব্যাপ্তি এবং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি অনুসারে বাজারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) অঞ্চল বা আয়তনের ভিত্তিতে বাজার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হতে পারে। (খ) সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন ও অতি দীর্ঘকালীন বাজার হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে। আবার বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতাভেদে বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার হিসেবে ভাগ করা যায়।

৬.১.৩ বাজারের অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

অঞ্চল বা আয়তনের দিক থেকে বিবেচনা করলে দ্রব্যের বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১. স্থানীয় বাজার,

২. জাতীয় বাজার ও

৩. আন্তর্জাতিক বাজার।

১. স্থানীয় বাজার : যেসব দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় একটি বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থানীয় বাজার বলে। যেমন, মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ প্রভৃতি দ্রব্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই ক্রয়বিক্রয় হয় বলে একে স্থানীয় বাজার বলে। সাধারণত তাড়াতাড়ি পচনশীল এবং সহজে পরিবহনযোগ্য নয় এ রকম বাজার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। স্বভাবতই এ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। বর্তমানে সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পচনশীল দ্রব্যের বাজার স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে বিদেশের বাজারেও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

---

১. "Economists understand by the term market not any particular market place in which, things are bought and sold but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same good tends to equality easily and quickly."- Cournot

২. জাতীয় বাজার : যেসব দ্রব্যের কেনাবেচা দেশের মধ্যে সমগ্র স্থান জুড়ে বিস্তৃত থাকে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন, চাল, কাপড়, কাগজ, ওষুধ প্রভৃতি দ্রব্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজেই আনা নেওয়া করা যায় এবং সর্বত্রই এগুলো ক্রয়বিক্রয় হয়। সুতরাং এসব দ্রব্যের বাজার জাতীয় ভিত্তিক। এ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা হয় ব্যাপক এবং উৎপাদনের পরিমাণ হয় বেশি।

৩. আন্তর্জাতিক বাজার : যেসব দ্রব্যের চাহিদা ও ক্রয়বিক্রয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সেগুলোর বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন সোনা, পাট, তুলা প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে লেনদেন হয়। কাজেই এগুলোর বাজার আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। এ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা সাধারণভাবে বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত থাকে বলে তা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

৬.১.৪ বাজারের সময়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

সময়ের ব্যাপ্তি অনুসারে বাজারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন (১) অতি স্বল্পকালীন বাজার, (২) স্বল্পকালীন বাজার, (৩) দীর্ঘকালীন বাজার এবং (৪) অতি দীর্ঘকালীন বাজার।

১. অতি স্বল্পকালীন বাজার : যে বাজার কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন স্থায়ী হয় তাকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ বাজারের স্থায়িত্বকাল এতই কম যে, প্রয়োজনানুযায়ী এ সময়ে দ্রব্যের যোগান বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। এ বাজারে দ্রব্যের দাম বাড়া-কমার ক্ষেত্রে চাহিদার ভূমিকাই মুখ্য। সাধারণত মাছ, শাকসবজি, দুধ প্রভৃতির বাজার অতি স্বল্পকালীন বাজার হিসেবে গণ্য হয়।

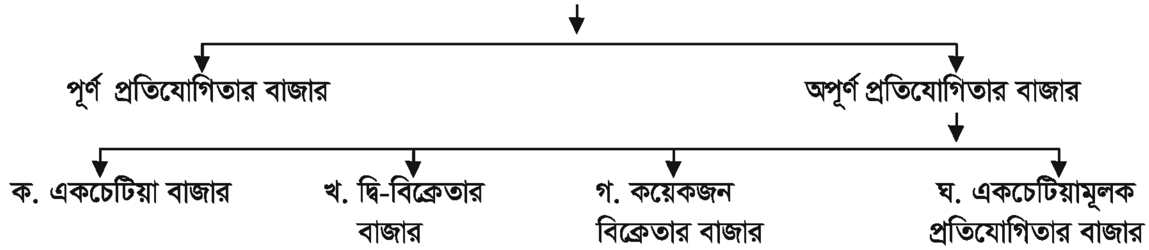
২. স্বল্পকালীন বাজার : যে বাজার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস স্থায়ী হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা পরির্বতনের সাথে সাথে যোগান সামান্য সাড়া দেয় বা পরিবর্তিত হয়। এ বাজারে তাই দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ী যোগান ব্যাপকভাবে বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। এ বাজারে দ্রব্যের দাম, যোগানের চেয়ে চাহিদা দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়। গামছা, লুঙ্গি, শাড়ি, মনোহারী দ্রব্য প্রভৃতির বাজার এরূপ স্বল্পকালীন বাজার হয়ে থাকে।

৩. দীর্ঘকালীন বাজার : যে বাজার কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর স্থায়ী হয় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। সাধারণত এ বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ চাহিদার সাথে যোগানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। ঘড়ি, মোটর গাড়ি, কম্পিউটার, মিলে প্রস্তুত কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যের বাজার দীর্ঘকালীন।

৪. অতি দীর্ঘকালীন বাজার : যে বাজারের স্থিতিকাল অতি দীর্ঘ এবং যে বাজারে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে তাকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলে। এ বাজারে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, সংখ্যা ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে। ফলে চাহিদারও ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। এ বাজার সাধারণত পনের থেকে বিশ বছর স্থায়ী হতে পারে। উড়োজাহাজ, ভারি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বাজার অতি দীর্ঘকালীন।

৬.১.৫ বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রকৃতিভেদে বাজারকে বেশ কয় ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে ছকের সাহায্যে বাজারের এ শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল :



১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার : যে বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, শতকরা একশত ভাগ একই গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয়, বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং বাজারে কেবল একটি দাম বিরাজ করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে। সোনার বাজার, শেয়ার বাজার প্রভৃতি পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার।

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার : যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কম হয়, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য একরকম হলেও তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে এবং বিক্রেতা দ্রব্যের দামকে কম বেশি প্রভাবিত করতে পারে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে। উল্লেখ্য এ ধরনের বাজারে কখনো কখনো ক্রেতার সংখ্যা কম হতে পারে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার চার ধরনের। যথা (ক) একচেটিয়া বাজার, (খ) দ্বি-বিক্রেতার বাজার, (গ) কয়েকজন বিক্রেতার বাজার এবং (ঘ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার।

(ক) একচেটিয়া বাজার : কোনো দ্রব্যের বাজারে কেবল এক জন বিক্রেতা থাকলে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। এ বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের চাহিদা অন্য দ্রব্য দ্বারা সহজে পূরণ করা যায় না। অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটির ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য থাকে না। এ বাজারে বিক্রেতা ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে বিদ্যুতের বাজার হল একচেটিয়া বাজারের উদাহরণ।

(খ) দুজন বিক্রেতার বাজার : যে বাজারে কোনো দ্রব্যের কেবল দুজন বিক্রেতা থাকে তাকে দুজন বিক্রেতার বাজার বা ডুওপলি বলে।

(গ) কয়েকজন বিক্রেতার বাজার : যে বাজারে কোনো দ্রব্যের কয়েকজন বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতা থাকে তাকে কয়েকজন বিক্রেতার বাজার বা অলিগোপলি বলে। আমাদের দেশে সাবান, টুথপেস্টের বাজার হল এ ধরনের বাজার।

(ঘ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার : যে বাজারে বেশ কিছু সংখ্যক বিক্রেতা সম্পূর্ণ এক না হলেও প্রায় একই ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে তাকে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার বলে। এ বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের হওয়ায় প্রত্যেকে নিজ নিজ দ্রব্যের দামের ওপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৬.২ বিস্তৃত বাজার

সব দ্রব্যের বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতি একরকম নয়। কোনো দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ, যেমন- মাছ, ফলমূল প্রভৃতির বাজার। আবার কোনো দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত বা বড়। যদি কোনো দ্রব্য সমগ্র দেশ জুড়ে এমনকি দেশের বাইরেও অবাধে ক্রয় বিক্রয় হয়, সে দ্রব্যের বাজারকে বিস্তৃত বাজার বলে। সাধারণত এ রকম দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এগুলো প্রায় সব জায়গায় ক্রয় বিক্রয় হয়। যেমন, সোনা, ওষুধপত্র, কাপড়, খাদ্য, বইপত্র প্রভৃতি দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত।

৬.২.১ বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি

কোনো দ্রব্যের বাজার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করলে তাকে বিস্তৃত বাজার বলে। বাজারের বিস্তৃতি অবশ্য অনেকগুলো শর্ত বা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। নিচে বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি বর্ণনা করা হল :

১. ব্যাপক চাহিদা : দ্রব্যের বাজার তার চাহিদার ওপর নির্ভর করে। যে দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তার বাজার বিস্তৃত হয়। পক্ষান্তরে দ্রব্যের চাহিদা কম হলে তার বাজার সংকীর্ণ হয়। সোনা, পাট, তুলা, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এগুলোর বাজার বিস্তৃত।

২. বিপুল যোগান : কোনো দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হতে হলে তার যোগানও প্রচুর হওয়া প্রয়োজন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গমের বিপুল যোগানের জন্য এর গমের বাজার বিশ্বব্যাপী। অন্যদিকে আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের যোগান কম বলে এর বাজার দেশেই সীমাবদ্ধ।

৩. স্থায়িত্ব : যেসব দ্রব্য দীর্ঘস্থায়ী সেগুলোর বাজার বিস্তৃত হয়। যেমন, সোনা, রূপা দীর্ঘস্থায়ী বলে এর বাজার বিস্তৃত। আবার ক্ষণস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ। যেমন, তরিতরকারির বাজার।

৪. পরিবহন যোগ্যতা : যেসব দ্রব্যের ওজন কম অথচ মূল্য বেশি সেগুলো সহজে ও অল্প খরচে দূরে পাঠানো যায় বলে তার বাজার বিস্তৃত হয়। সোনা, রূপা, সহজেই বহন করা যায় বলে এর বাজার বিস্তৃত। কিন্তু সহজে পরিবহনযোগ্য নয় বলেই ইটের বাজার বিস্তৃত নয়।

৫. শ্রেণীবিভাগ ও নমুনাকরণের সুবিধা : যেসব দ্রব্য গুণাগুণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর নমুনা দূরের ক্রেতাদের কাছে পাঠানো যায় সেগুলোর বাজার বিস্তৃত হয়। যেমন, পাটের গুণাগুণ অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে বিভক্ত করে ক্রেতাদের কাছে পাঠানো যায় বলে এর বাজার বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে শ্রেণীবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাবে বাজার সংকীর্ণ হয়ে পড়ে যেমন মাংসের বাজার।

৬. উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে দ্রব্যাদি সহজে ও কম খরচে দূরে পাঠানো যায় বলে বাজার বিস্তৃত হয়। সঙ্গত কারণেই উন্নত রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের অভাবে দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ হয়।

৭. শান্তি ও নিরাপত্তা : দেশের ভেতরে ও বাইরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকলে নির্বিঘ্নে দ্রব্যসামগ্রীর আদান প্রদান চলে। ফলে বাজার বিস্তৃত হয়। পক্ষান্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ হয়।

৮. উদার বাণিজ্যনীতি : সরকারের অবাধ ও উদার বাণিজ্যনীতি পণ্যের বাজার বিস্তৃত করে। অন্যদিকে, ব্যবসায় বাণিজ্যে বাধা নিষেধ আরোপ করা হলে দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

৯. বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণের সহজলভ্যতা : বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণ সহজলভ্য হলে দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বাজার বিস্তৃত হয়। তা না হলে বাজার সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

১০. প্রচারণা : বর্তমান যুগে দ্রব্যের বাজারের বিস্তৃতি প্রচারণার ওপর নির্ভর করে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা প্রভৃতির মাধ্যমে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার অব্যাহত থাকলে সে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং বাজার বিস্তৃত হয়।

৬.৩ বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ- চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে

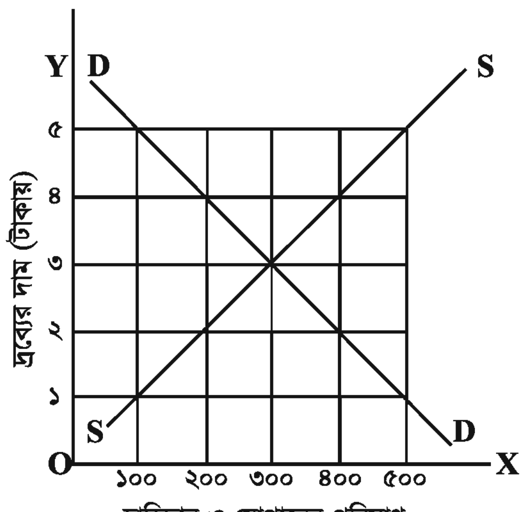
ভোক্তা তার প্রয়োজন অনুযায়ী একটি নির্ধারিত দামে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে। দ্রব্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দ্রব্যের দাম বিক্রেতা, ক্রেতা, কারো একক সিদ্ধান্ত অথবা ক্রেতা বিক্রেতার সমঝোতা -এর কোনো উপায়েই নির্ধারিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম বাজার শক্তির প্রভাবে নির্ধারিত হয়। বাজার শক্তির মধ্যে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান দাম নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বাজারে কোনো দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাধারণত কোনো দ্রব্যের বাজারে সেই দ্রব্যের একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। ক্রেতাদের দিক থেকে আসে দ্রব্যের চাহিদা। বাজারে ক্রেতাদের চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় মোট চাহিদা। অন্যদিকে বিক্রেতাদের দিক থেকে আসে দ্রব্যের যোগান, বাজারে বিক্রেতাদের যোগানের সমষ্টিকে বলা হয় মোট যোগান। বাজারে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি হলে দাম ঊর্ধ্বগামী হয়। আবার চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হলে দাম হয় নিম্নগামী। একসময় এমন এক পর্যায় আসে যেখানে একটি দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগান পরস্পর সমান হয়। এ দামই হল দ্রব্যের নির্ধারিত দাম। এ দামের বাড়া কিংবা কমার কোনো প্রবণতা থাকে না। একে ভারসাম্য দাম বলে এবং বাজারে তা স্থায়ী হয়। নিচে একটি তালিকার সাহায্যে চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ দেখানো হল।

চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ

দ্রব্যের দাম	দ্রব্যের মোট চাহিদা (চ)	দ্রব্যের মোট যোগান (য)	চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক	দামের অবস্থা
৫.০০ টাকা	১০০ একক	৫০০ একক	চ < য	দামের নিম্নগতি
৪. ০০ টাকা	২০০ একক	৪০০ একক	চ < য	দামের নিম্নগতি
৩. ০০ টাকা	৩০০ একক	৩০০ একক	চ = য	ভারসাম্য দাম
২. ০০ টাকা	৪০০ একক	২০০ একক	চ > য	দামের উর্ধ্বগতি
১. ০০ টাকা	৫০০ একক	১০০ একক	চ > য	দামের উর্ধ্বগতি

উপরের তালিকায় দেখা যায়, ৫.০০ টাকা অথবা ৪.০০ টাকা দামে কোনো দ্রব্যের মোট যোগান তার চাহিদার চে বেশি। এ অবস্থায় অবিক্রীত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতারা দাম কমায়। ফলে দামের নিম্নগতি দেখা দেয়। আবা ২.০০ টাকা অথবা ১.০০ টাকা দামে ঐ দ্রব্যের মোট চাহিদা তার যোগানের চেয়ে বেশি বলে ক্রেতাদের চাহিদা অনেকট অপূর্ণ থেকে যায়। এ অবস্থায় তারা বেশি দাম দিয়ে দ্রব্যটি পেতে চায় ফলে দ্রব্যটির দামের উর্ধ্বগতি দেখা দেয় কেবল ৩.০০ টাকা দাম হলে দ্রব্যটির মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে সমতা আসে এবং দামের হ্রাস কিংব বৃদ্ধির কোনো প্রবণতা থাকে না। তাই ৩.০০ টাকা হল দ্রব্যটির নির্ধারিত দাম। বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণের বিষয় রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যায়।



চিত্রে DD হল চাহিদা রেখা এবং SS হল যোগান রেখা ধরা যাক, প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম হল ৫.০০ টকা। দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হল যথাক্রমে ১০ একক ও ৫০০ একক। এখন চাহিদার চেয়ে যোগা অনেক বেশি বলে দাম কমবে। দাম কমে ৪.০০ টাক হলেও একই অবস্থার উদ্ভব হবে অর্থাৎ দাম কমতে থাকবে।

আবার, ধরি দ্রব্যের দাম হল ১.০০ টাকা। এ দামে চাহিদা যোগানের পরিমাণ হল যথাক্রমে ৫০০ একক এবং ১০ একক। এক্ষেত্রে যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি বলে দা বাড়বে।

কিন্তু দাম যখন ৩.০০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানে পরিমাণ পরস্পর সমান অর্থাৎ উভয়ই ৩০০ একক। এটি ভারসাম্য। এ পরিমাণ অবস্থায় দাম বাড়বেও না কমবে না। তাই ৩.০০ টাকা দামই হল দ্রব্যটির নির্ধারিত দাম বা ভারসাম্য দাম। এভাবে কোনো দ্রব্যের দাম তার চাহিদা যোগানের সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয়।

৬.৪ বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা

বাজার ব্যবস্থা : যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায় তাকে বাজার ব্যবস্থা বলে। বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্য ভোগের জন্য ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর অতিক্র করে। এ স্তরগুলো হল উৎপাদন শেষে উৎপাদিত দ্রব্য সংগ্রহ বা একত্রিকরণ, শ্রেণীবিভাগ, গুদামজাতকরণ সংরক্ষণ, পরিবহন, অর্থ সংস্থান, ঝুঁকিবহন, বিজ্ঞাপন প্রদান, বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিক্রয় ইত্যাদি। এস কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে উৎপাদিত দ্রব্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়।

বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি :

বাংলাদেশে কৃষিজাত ও শিল্পজাত উভয় ধরনের দ্রব্যেরই বাজার ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ও ত্রুটিপূর্ণ। শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার ব্যবস্থার চেয়ে কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার ব্যবস্থা অধিক সমস্যাসংকুল ও ত্রুটিপূর্ণ। নিচে বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো ব্যাখ্যা করা হল :

১. নিম্নমানের দ্রব্য : এ দেশে উৎপাদিত বেশিরভাগ কৃষিজাত দ্রব্যেরই মান অতি নিম্ন। নিম্নমানের বীজ, সার ও কীটনাশকের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে দ্রব্যের মান নিম্ন হয়। ফলে কৃষকদেরকে তা কম দামে বিক্রয় করতে হয়।

গুটিকয়েক দ্রব্য ছাড়া বাংলাদেশে শিল্পখাতে উৎপাদিত দ্রব্যের মানও বেশ নিম্ন। নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার, শিল্প-শ্রমিকের অদক্ষতা, জ্বালানির অভাব, ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট প্রভৃতি কারণে উৎপাদিত দ্রব্যের মান নিম্ন হয়। ফলে উৎপাদনকারী যে দামে দ্রব্য বিক্রয়ের আশা রাখে নিম্নমানের দরুন সে দ্রব্যের চাহিদা কমে যায় এবং কম দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে হয়।

২. দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগের অভাব : আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যগুলোর গুণাগুণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয় না। অনেক সময়ই উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য মিশ্রিত হয়। ফলে উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্যেরও দাম কমে যায়। যথাযথভাবে শ্রেণীবিভাগের অভাবে অনেক সময় আবার নিম্নমানের কৃষিজাত দ্রব্যও উচ্চ দামে বিক্রয় হয়।

দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যেরও মান অনুযায়ী ঠিকমতো শ্রেণীবিন্যাস করা হয় না। হোসিয়ারি দ্রব্য, লুঙ্গি, গামছা, ভোজ্য তেল, ঘি, ময়দা ইত্যাদির দ্রব্যমান অনুযায়ী ঠিকমতো শ্রেণীবিভাগ করা হয় না।

বড় বড় শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করা থাকলেও প্রচারের অভাবে ক্রেতাসাধারণ সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

৩. অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে বিভিন্ন বাজারের সাথে সংযুক্ত করার জন্য রাস্তা কিংবা রেলপথের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। নদীপথও সবসময় নাব্য থাকে না। তাছাড়া টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগের মাধ্যমগুলোরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এসব কারণে বেশিরভাগ কৃষক দোরগোড়াতেই কম দামে তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে ফেলে।

অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যও ঠিকমতো পৌঁছানো যায় না। দেশে রেলপথের উন্নয়ন না ঘটায় সড়কপথে মালামাল পরিবহনের ব্যয় খুব বেশি পড়ে। এর ফলে একদিকে দ্রব্যের দাম বেশি হয় এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় একই দ্রব্যের বিভিন্ন দাম দেখা দেয়।

৪. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব : দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে দালাল, ফড়িয়া, আড়তদার, মজুতদার প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব দেখা যায়। তারা কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে দ্রব্য কিনে পরে বেশি দামে বিক্রয় করে। ফলে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। অথচ যারা উৎপাদন করে তারা প্রাপ্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়।

শিল্প খাতে উৎপাদিত দ্রব্যও বেশিরভাগ নানা হাত ঘুরে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছায়। শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য কল-কারখানার গুদামঘর থেকে বড় বড় পাইকারী বিক্রেতারা ক্রয় করে। পরে তা ছোট ছোট পাইকারী বিক্রেতার মাধ্যমে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে যায়। এভাবে শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য বেশ কয় হাত বদল হয় বলে তার দাম বেশি হয়।

৫. গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাব : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত দ্রব্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে ফসল তোলার পরপরই কৃষকেরা তা কম দামে বিক্রয় করে ফেলে। সংরক্ষণের অভাবে দ্রব্যের গুণগত মানও কমে যায়।

শহরাঞ্চলেও প্রয়োজনীয় গুদাম ঘরের অভাবে শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য ঠিকমতো গুদামজাত করা যায় না। ছোট ছোট পাইকারী বিক্রেতাদের উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বারবার দ্রব্যাদি নিয়ে আসতে হয়। ফলে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যের দাম বেশি হয়।

৬. দ্রব্য বাজারজাতকরণে আর্থিক সহায়তার অভাব : উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে দ্রব্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কৃষকদের অর্থের প্রয়োজন পড়ে। বিশেষ করে কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র বলে দ্রব্যের বাজারজাতকরণের জন্য তাদের অর্থের দরকার হয়। শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণের জন্য ছোট ছোট খুচরা ব্যবসায়ীদের ঋণের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু দেশে এখনো এমন সংস্থা গড়ে উঠেনি যা দ্রব্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

৭. ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো সাধারণ মানের কোনো ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে সের, কেজি, কাঁচি, পাকি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি এখনো প্রচলিত রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে সের ও কেজির যথেচ্ছ ব্যবহার। ওজন পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে ও ত্রুটিপূর্ণ দাঁড়িপাল্লা ব্যবহারের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পলি ও কলি দুই বোন। তারা উভয়েই লেখাপড়ার পাশাপাশি বাড়িতে সবজির বাগান, ফুলের বাগান ও মুরগির খামার দেখাশুনা করে। তারা স্থানীয় বাজারে তেমন মূল্য না পাওয়ায় জাতীয় বাজারে ফুল ও মুরগি বিক্রি করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থায় তেমন সুফল পাওয়া যায় না।

১। স্থানীয় বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর দাম কম কেন ?

ক. চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি   খ. চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি
গ. যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা   ঘ. সংরক্ষণ সমস্যা

২। স্থানীয় বাজারের বৈশিষ্ট্য হল -

i. দ্রব্যের চাহিদা কম
ii. উৎপাদনের পরিমাণ কম
iii. উৎপাদনের পরিমাণ বেশি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. i ও ii   ঘ. i, ii এবং iii

৩। নিচের কোনটি বাংলাদেশে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের সর্বোত্তম উদাহরণ?

ক. প্রাকৃতিক গ্যাস   খ. ডাক টিকেট
গ. সয়াবিন তেল   ঘ. মোটা চাল

৪। নিচের কোনটি অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের শ্রেণীভুক্ত ?

i. একচেটিয়া বাজার   ii. একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার
iii. কয়েকজন বিক্রেতার বাজার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii এবং iii

৫। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা সংকীর্ণ হয়-

i. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বের জন্য
ii. কৃষকদের সংরক্ষণের সমস্যার জন্য
iii. যে দাম পায় তাতে কৃষক খুশি থাকায়

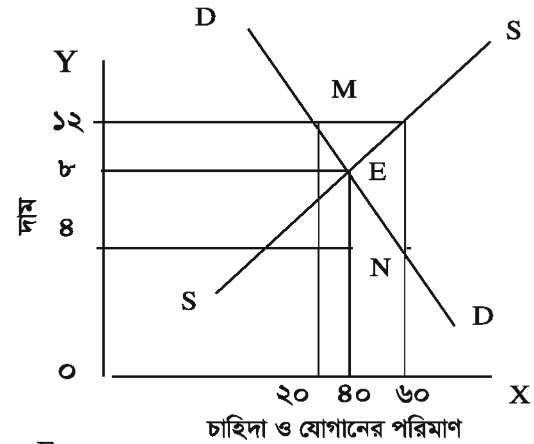
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii এবং iii

৬। বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় যখন-

ক. দ্রব্যের চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হয়   খ. দ্রব্যের যোগান চাহিদার চেয়ে বেশি হয়
গ. দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়   ঘ. দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সর্বোচ্চ হয়

নিচের চিত্র দেখে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



৭। চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু কোনটি?

ক. M খ. E

গ. N ঘ. S

৮। দ্রব্যের দাম যদি ১২ টাকা হয় তাহলে-

ক. যোগান চাহিদা অপেক্ষা বেশি হবে খ. চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশি হবে

গ. চাহিদা ও যোগান সমান হবে ঘ. চাহিদা ও যোগান শূন্য হবে

৯। বাংলাদেশের কৃষি পন্যের বাজারজাতকরণের সমস্যাবলি হল-

i. ফড়িয়া ও দালালদের দৌরাত্ম্য

ii. কৃষকরা দরিদ্র

iii. ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মল্লিক সাহেব মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরেছেন। তিনি একদিন বাজারে গেলেন কিছু দ্রব্য কেনার ইচ্ছায়। তিনি সেখানে দেখলেন অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতারা বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। পরে তিনি অন্য একটি দ্রব্যের বাজারে গিয়ে দেখলেন অল্প কয়েক জন বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করছেন। তবে দ্রব্যের দামের উপর তাদের যথেষ্ট প্রভাবও বিদ্যমান। এর ফলে ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ক. মল্লিক সাহেবের দেখা দ্বিতীয় বাজারটি কী ধরনের বাজার?

খ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রথমোক্ত ধরনের বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

গ. মল্লিক সাহেবের দেখা দুধরনের বাজারের মধ্যেকার তিনটি তুলনামূলক পার্থক্য উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার মাত্রই ক্রেতার জন্য ক্ষতিকারক'- এ বিষয়ে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

২। জনাব মান্নান তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েসহ অতিসম্প্রতি গ্রাম থেকে ঢাকার পাশে উপশহরে বাস করছেন। তিনি পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের জন্য বাড়ির নিকটবর্তী বাজারে যান। তাঁর নতুন চাকরি ঢাকার এমন একটি অংশে যেখানে অনেক সফল ব্যবসায়ী বাস করেন। তাঁর পরিবারের অবস্থান ঢাকার পাশে এমন এক জায়গায় যেখানে অনেক কৃষক, কারখানার শ্রমিক এবং দিনমজুর বাস করে। জনাব মান্নান শুনতে পেয়ে অবাক হলেন যে ঢাকার কাঁচাবাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক। কারণ তিনি যেখানে বাস করেন এবং তিনি যেখানে চাকরি করেন, এই দুই জায়গায় ফল এবং সবজির দামের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

ক. স্থানীয় বাজার কী?

খ. জাতীয় বাজার কীভাবে স্থানীয় বাজার থেকে আলাদা, তা ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব মান্নানের অভিজ্ঞতার আলোকে অর্থনীতিতে কেন দুটি স্থানীয় বাজারে দামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাজারে বহু সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতি কীভাবে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে এবং এ ধরনের দাম বৃদ্ধি রোধকল্পে করণীয় বিষয় ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা
MONEY AND BANKING SYSTEM

৭.১.১ দ্রব্য বিনিময় প্রথা

প্রাচীনকালে অর্থ বা অন্য কোনো প্রকার একক বিনিময় মাধ্যমের প্রচলন ছিল না। তখন কারো কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন হলে সে নিজের জিনিসের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে তা সংগ্রহ করত। যেমন, কৃষক তার ধানের বিনিময়ে তাঁতীর কাছ থেকে কাপড় এবং জেলে তার মাছের বিনিময়ে কুমারের নিকট থেকে হাঁড়ি-পাতিল সংগ্রহ করত। এভাবে মানুষ একদ্রব্যের পরিবর্তে অন্যদ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে লেনদেন করে পরস্পরের অভাব পূরণ করত। একদ্রব্যের পরিবর্তে অন্যদ্রব্যের এরূপ বিনিময়ের ব্যবস্থাকে বিনিময় প্রথা (Barter system) বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো এ রকম দ্রব্য বিনিময় হয়ে থাকে। দ্রব্য বিনিময় প্রথায় নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত রয়েছে,

১. একজনের দ্রব্য অন্যজনের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

২. কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য লাভের বিনিময়ে নিজ দ্রব্য প্রদানে ইচ্ছুক হতে হবে।

৩. কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগের পরিমাণ নিজ দ্রব্য ত্যাগের ফলে যে পরিমাণ উপযোগ হ্রাস পায় তার চেয়ে বেশি হতে হবে।

৭.১.২ দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ

দ্রব্য বিনিময় প্রথার কিছু অসুবিধা রয়েছে। নিচে এ অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হল :

১. অভাবের অমিল : দ্রব্য বিনিময় প্রথার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবের অমিল। যেমন, এক জন কৃষক ধানের বিনিময়ে কাপড় চায়। কিন্তু তাঁতীর ধানের প্রয়োজন নেই। এরূপ অবস্থায় ধান ও কাপড়ের বিনিময় সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে কৃষককে এমন এক জন লোককে খুঁজে বের করতে হবে যে কাপড়ের বিনিময়ে ধান নিতে ইচ্ছুক। সেটা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

২. দ্রব্য ভাগ করার অসুবিধা : এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে আংশিকভাবে তা বিনিময় করা যায় না। যেমন, এক জন ব্যক্তির গরু আছে এবং তার একটি কলমের প্রয়োজন। কলমের তুলনায় গরুর মূল্য অনেকগুণ বেশি। এ অবস্থায় গরুকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে তার একটি অংশের সাথে কলমের বিনিময় সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে গরু ও কলমের মধ্যে বিনিময় হতে পারে না।

৩. মূল্য পরিমাপের অসুবিধা : দ্রব্য বিনিময় প্রথায় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের কোনো সাধারণ মানদণ্ড থাকে না। মাছের বিনিময়ে কি পরিমাণ আলু অথবা একটি গরুর পরিবর্তে কত মন ধান পাওয়া যাবে, এ দ্রব্যগুলোর আর্থিক মূল্য না জানা থাকলে তা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। কাজেই এ ব্যবস্থায় বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৪. সঞ্চয়ের অসুবিধা : দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের অর্থমূল্য জানা না থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় করতে হলে দ্রব্যসামগ্রী, শস্য প্রভৃতি জমিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ জিনিসই বেশি দিন হয়ে গেলে নষ্ট হয় বা তার গুণগত মান কমে যায়। এ জন্য দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। ফলে এ প্রথায় মানুষ সঞ্চয়ের সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

৫. ঋণ পরিশোধের অসুবিধা : দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় দ্রব্যের মাধ্যমেই ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় ঋণ গ্রহীতার পক্ষে অবিকল একই রকম দ্রব্য ফেরত দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করলে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার কোনো এক জনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

৬. মূল্য স্থানান্তরের অসুবিধা : দ্রব্য বিনিময় প্রথায় অর্থের প্রচলন না থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য স্থানান্তর করা অসুবিধাজনক। কেননা মূল্য স্থানান্তরের জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সম্পত্তি একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। বিনিময় প্রথায় মূল্য স্থানান্তরের সুবিধা না থাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্রমবিকাশ বিঘ্নিত হয়।

দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় এসব অসুবিধার কারণে সমাজে অবাধ লেনদেন ও ব্যবসায় বাণিজ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই কালক্রমে এ প্রথা অচল হয়ে পড়ে এবং সমাজে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের প্রচলন শুরু হয়।

৭.২.১ অর্থ

অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম। যে বস্তু দ্বারা মানুষ পণ্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করে, যা দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারণ ও যাবতীয় দেনা পাওনা মেটানো হয় তাকে অর্থ বলে। অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবেও কাজ করে। অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। আর. পি. কেন্ট (R. P. KENT) বলেন, অর্থ এমন জিনিস যা বিনিময়ের মাধ্যম বা মূল্যের মান হিসেবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত। অর্থনীতিবিদ ক্রাউথারের (Crowther) মতে, "যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সবার কাছে গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাই অর্থ।" জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H. COLE) বলেন, "অর্থ এমন একটি বস্তু যা সকলেই দেনা পাওনা মেটাতে ও ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করে।" সুতরাং যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য তাকেই অর্থ বলা যায়।

৭.২.২ অর্থের কার্যাবলি

আধুনিককালে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অর্থ নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। নিচে অর্থের কার্যাবলির বিবরণ দেওয়া হল :

১. বিনিময়ের মাধ্যম : অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ হল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলেই অর্থ দ্বারা যে কোনো সময় যে কোনো পরিমাণ পণ্য ক্রয় বিক্রয় করা যায়। অর্থ প্রচলনের ফলে বিনিময়ের কাজ সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছে।

২. মূল্যের পরিমাপক : অর্থের মাধ্যমে সবরকম দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপ করা যায়। কিলোগ্রাম যেমন ওজনের এবং মিটার যেমন দৈর্ঘ্যের পরিমাপক, ঠিক তেমনি অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। আমরা কোনো বস্তুর মূল্য টাকার অংকে প্রকাশ করে ঐ দ্রব্যের দাম হিসেবে গণ্য করি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক ব্যক্তি পাঁচ টাকা দামে একটি দ্রব্য ক্রয় করে। এক্ষেত্রে পাঁচ টাকা ঐ দ্রব্যের মূল্যের পরিমাপক।

৩. স্থগিত লেনদেনের মান : অর্থ দ্বারা মানুষের ভবিষ্যৎ দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করা হয়। অর্থের মাধ্যমে সহজেই ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ করা যায়। দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের মাধ্যমে দেনা পাওনার হিসাব নিকাশে অসুবিধা ছিল।

৪. সঞ্চয়ের বাহন : অর্থ সঞ্চয়ের বাহন রূপে কাজ করে। মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চায়। দ্রব্য জমিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তবে অর্থ সঞ্চয় করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। এ জন্য মানুষ তার উদ্বৃত্ত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে অর্থ সঞ্চয় করে।

৫. মূল্য স্থানান্তর : অর্থ প্রচলনের ফলে মানুষ কোনো দ্রব্যসামগ্রী বা সম্পত্তি বিক্রয় করে তার মূল্য অর্থের আকারে সংগ্রহ করে। সেই অর্থ দ্বারা সে সহজেই অন্যস্থানে দ্রব্যাদি বা সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে। এভাবে অর্থ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য স্থানান্তরের মাধ্যমরূপে কাজ করে।

৬. ঋণের ভিত্তি : বর্তমানকালে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতি ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে জমাকৃত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে থাকে। তাই অর্থকে ঋণের ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়।

৭. তারল্যের মান : অর্থ হল সবচেয়ে তরল সম্পদ। অর্থের সাহায্যে যে কোনো দ্রব্য যে কোনো সময় ক্রয় করা যায়।

৮. তৃপ্তি বৃদ্ধির উপায় : ভোক্তার প্রধান লক্ষ্য হল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করা। এ উদ্দেশ্যে সে এমন ভাবে অর্থ ব্যয় করে যাতে দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ তার দামের সমান হয়। এভাবে অর্থ ব্যবহারের ফলে ভোক্তার তৃপ্তি সর্বাধিক হওয়ার সুযোগ থাকে।

৯. সামাজিক মর্যাদার প্রতীক : সমাজের মানুষের মর্যাদা অর্থ ক্ষমতার প্রেক্ষিতেই নির্ণীত হয়। সাধারণত সমাজে যার কাছে যত বেশি অর্থ থাকে, তার প্রভাব প্রতিপত্তি তত বেশি হয়।

অর্থের এসব কার্যাবলির মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থা সহজ ও গতিশীল হয়েছে। ফলে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে।

৭.২.৩ অর্থের প্রচলন কীভাবে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ দূর করেছে

অর্থ আবিষ্কারের পূর্বে দীর্ঘকাল যাবত দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। এ প্রথার নানারূপ ত্রুটির ফলে দ্রব্য লেনদেন ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। অর্থ প্রচলনের ফলে কীভাবে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ দূর হয়েছে তা নিচে বর্ণনা করা হল :

১. দ্রব্য বিনিময় প্রথায় বিনিময়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অভাবের অমিলের জন্য বিনিময় কার্য বিঘ্নিত হত। কিন্তু অর্থের সাহায্যে যে কোনো বস্তু ক্রয়বিক্রয় করা যায় বলে সে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

২. অর্থ ব্যবহারের ফলে আগের মতো দ্রব্যকে ভাগ করে বিনিময় করার প্রয়োজন হয় না। ছোট থেকে বড় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সহজেই পাওয়া সম্ভব।

৩. দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের সমস্যা ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে যে কোনো বস্তুর মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

৪. দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রী জমিয়ে রাখা সম্ভব হত না। কিন্তু এখন যে কোনো জিনিসের মূল্য অর্থের মাধ্যমে সহজেই সঞ্চয় করা যায়। এ জন্য দ্রব্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূল্য বিনষ্টের ঝুঁকি নিতে হয় না।

৫. অর্থ প্রচলনের ফলে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ সহজ হয়েছে। কোনো দ্রব্যসামগ্রীর পরিবর্তে অর্থ ঋণ নেওয়া হয় এবং অর্থ দিয়েই তা পরিশোধ করা হয়।

৬. দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য স্থানান্তর করতে হলে দ্রব্যসামগ্রীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে হত। কিন্তু অর্থ প্রচলনের ফলে এখন যে কোনো দ্রব্য বা সম্পত্তির মূল্য অর্থের আকারে সহজেই স্থানান্তর করা যায়।

এভাবে দেখা যায়, অর্থ প্রচলনের মাধ্যমে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো দূর হয়েছে। ফলে লেনদেন ব্যবস্থা সহজ ও নিরাপদ এবং মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গতিশীল হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন ও চাকার উদ্ভাবনের মতোই অর্থের উদ্ভাবনও একটি অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা।

৭.২.৪ মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। নিচে মুদ্রার শ্রেণীবিভাগের বিবরণ দেওয়া হল :

১. **হিসাবী মুদ্রা ও প্রকৃত মুদ্রা :** ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা, হিসাবী মুদ্রা ও প্রকৃত মুদ্রা। যে মুদ্রার মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করা হয়, লেনদেনের হিসাব নিকাশ রাখা হয় ও লেনদেন চলে তাকে হিসাবী মুদ্রা বলে। হিসাবী মুদ্রা বলতে মূলত দেশে প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহৃত নামকে বুঝায়। যেমন, বাংলাদেশে "টাকার" নামে হিসাব নিকাশ রাখা হয় বলে টাকাকে এ দেশের হিসাবের মুদ্রা বলে। ইংল্যান্ডে পাউন্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডলার, রাশিয়ায় রুবল, জাপানে ইয়েন ও ভারতে রুপী হিসাবী মুদ্রা হিসেবে কাজ করে।

অন্যদিকে যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে লেনদেনের কাজ করে এবং সঞ্চয় করে তাকে প্রকৃত মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ১০০০টাকা ইত্যাদি কাগজী নোট এবং ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা ও ৫ টাকা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রাগুলো প্রকৃত মুদ্রা।

২. **বিহিত মুদ্রা ও ঐচ্ছিক মুদ্রা :** গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে মুদ্রাকে আবার বিহিত মুদ্রা ও ঐচ্ছিক মুদ্রা এ দুভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি আইন দ্বারা যে মুদ্রা প্রচলিত এবং যা সবাই গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

অন্যদিকে যে মুদ্রা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না অথচ ব্যবসায়িক লেনদেনে লোক তা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাকে ঐচ্ছিক মুদ্রা বলে। ঐচ্ছিক মুদ্রা লোক গ্রহণ করতেও পারে, নাও পারে। চেক, ব্যাংক ড্রাফট, প্রাইজবন্ড প্রভৃতি হল ঐচ্ছিক মুদ্রা। এগুলোকে 'প্রায় মুদ্রা'ও বলা হয়।

৩. **অসীম বিহিত মুদ্রা ও সসীম বিহিত মুদ্রা :** গ্রহণসীমার দিক হতে বিহিত মুদ্রাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা অসীম বিহিত মুদ্রা ও সসীম বিহিত মুদ্রা। যে মুদ্রা দ্বারা আইনত যে কোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় তাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ১০টাকা, ১০০ টাকার নোট প্রভৃতি অসীম বিহিত মুদ্রা। এসব নোটের যে কোনো একটির দ্বারা যে কোনো পরিমাণ দেনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।

অন্যদিকে যে বিহিত মুদ্রা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায় এবং আইনগতভাবে অধিক গ্রহণে জনগণকে বাধ্য করা যায় না তাকে সসীম বিহিত মুদা বলে। জনগণ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে আবার নাও গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশে ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা এবং ১ টাকার ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা সসীম বিহিত মুদ্রা।

৪. **প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা :** বস্তুগত মূল্যমানের দিক থেকে ধাতব মুদ্রা দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা, প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা। যে মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য ও তার ধাতব বা অন্তর্নিহিত মূল্য সমান থাকে তাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে। এ মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে মুদ্রার সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়। সাধারণত এ রকম মুদ্রা দেশে অসীম বিহিত মুদ্রা হিসেবে চালু থাকে। ১৯৪১ সালের আগে ভারতে ইংল্যান্ডের রাজার মাথার ছাপযুক্ত প্রচলিত ১ টাকার ধাতব মুদ্রা প্রামাণিক মুদ্রা ছিল।

অন্যদিকে যে মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য তার অন্তর্নিহিত মূল্য বা ধাতব মূল্যের চেয়ে বেশি তাকে প্রতীক মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা প্রভৃতি প্রতীক মুদ্রা। এসব মুদ্রাকে গলিয়ে বিক্রি করলে তার ধাতব মূল্য দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম হয়।

৫. **ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা :** তৈরির উপকরণের দিক থেকে সরকারি মুদ্রাকে দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা, ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা। ধাতব খন্ড দ্বারা তৈরি প্রকৃত মুদ্রাকে ধাতব মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা প্রভৃতি ধাতব মুদ্রা আছে।

অন্যদিকে যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজী মুদ্রা বলে। কাগজী মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। এ মুদ্রার উপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক। সাধারণত কাগজী মুদ্রার উপর লিখিত মূল্য এর অভ্যন্তরীণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন মূল্য মানের কাগজের নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে। বাংলাদেশের ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা নোটগুলো কাগজী মুদ্রা। কাগজী মুদ্রা এখন সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৬. **রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা ও রূপান্তরের অযোগ্য মুদ্রা :** কাগজী মুদ্রাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা-রূপান্তরযোগ্য ও রূপান্তরের অযোগ্য কাগজী মুদ্রা। যে কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকার সমমূল্যের সোনা, রূপা বা বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করতে বাধ্য থাকে তাকে রূপান্তরযোগ্য কাগজী মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে প্রচলিত ৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার কাগজী নোট রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা।

অন্যদিকে যে কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো ধাতব মুদ্রা বা সোনা, রূপা পাওয়া যায় না তাকে

রূপান্তরের অযোগ্য মুদ্রা বলে। কেবল সরকারের আদেশে এ রকম কাগজী নোট বাজারে চালু থাকে। বাংলাদেশে ১ টাকা ও ২ টাকার নোট রূপান্তরের অযোগ্য কাগজী মুদ্রা। এ জাতীয় অর্থকে 'আদিষ্ট' মুদ্রা বলা হয়।

বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষিতে অর্থের শ্রেণীবিভাগ নিম্নোক্ত ছকগুলোর সাহায্যেও দেখানো যায় :

(ক) মুদ্রা

- হিসাবী মুদ্রা
- প্রকৃত মুদ্রা
  - ঐচ্ছিক মুদ্রা
  - বিহিত মুদ্রা
    - ধাতব মুদ্রা
    - কাগজী মুদ্রা
      - প্রামাণিক মুদ্রা
      - প্রতীক মুদ্রা

(খ)

বিহিত মুদ্রা

- অসীম বিহিত মুদ্রা
- সসীম বিহিত মুদ্রা

(গ)

কাগজী মুদ্রা

- রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা
- রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা

৭.৩.১ ব্যাংক

ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য, উৎপাদন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান করে। এ ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনায় ব্যাংক নিজস্ব মুদ্রা বা মূলধন খাটায় না; আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থই ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এ জন্য ব্যাংককে 'ঋণের কারবারী' বলা হয়। ব্যাংক জনসাধাণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতের ওপর যে হারে সুদ প্রদান করে তা সবসময়েই ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদের হারের চেয়ে কম। এ দুই সুদের হারের পার্থক্যই ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। এ মুনাফার ওপর ভিত্তি করেই ব্যাংক ব্যবসা টিকে আছে।

৭.৩.২ ব্যাংকের প্রকার ভেদ

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা ও কাজের প্রকৃতি অনুসারে ব্যাংকগুলোকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, সঞ্চয়ী ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রভৃতি। নিচে এসব ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক : যে ব্যাংক সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে দেশের অর্থ, ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের প্রধান কাজ হল দেশে অর্থ প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা।

এ ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, সরকারের ব্যাংকার ও আর্থিক পরামর্শদাতা, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড হল যথাক্রমে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক : যে ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও উদ্যোক্তাদের স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। সংক্ষেপে এ ব্যাংককে 'স্বল্পমেয়াদী ঋণের কারবারী'ও বলা হয়। জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতের ওপর স্বল্প হারে সুদ দিয়ে এবং প্রদত্ত ঋণের ওপর উচ্চ হারে সুদ আদায় করে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা আহরণ করে। অগ্রণী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ প্রভৃতি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক।

৩. কৃষি ব্যাংক : কৃষির উন্নতিকল্পে যে ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক সার, বীজ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য কৃষকদের স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ছাড়া এ ব্যাংক গবাদি পশু, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য মধ্য মেয়াদী এবং জমিতে স্থায়ী উন্নতি বিধান ও মূল্যবান কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণও প্রদান করে। আমাদের দেশে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' এ ধরনের একটি ব্যাংক।

৪. শিল্প ব্যাংক : দেশে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, পুরাতন শিল্পগুলোর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য যে ব্যাংক ঋণ প্রদান করে তাকে শিল্প ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকার ঋণই প্রদান করে। এ দেশে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এ জাতীয় ব্যাংক।

৫. বিনিময় ব্যাংক : যে ব্যাংক একদেশের অর্থকে অন্যদেশের অর্থে রূপান্তর কারে তাকে বিনিময় ব্যাংক বলে। বৈদেশিক বিনিময় বিল বা হুন্ডি ক্রয় বিক্রয় করাও এ ব্যাংকের কাজ। এ ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে অবস্থিত লয়েড ব্যাংক, ব্যাংক অফ চায়না, চার্টাড ব্যাংক প্রভৃতি বিনিময় ব্যাংক।

৬. সঞ্চয়ী ব্যাংক : যে ব্যাংক জনসাধারণের ভেতর সঞ্চয়ের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে এবং তাদের কাছ থেকে উচ্চ সুদের হারে বিভিন্ন মেয়াদের আমানত গ্রহণ করে তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো ব্যাংক নেই তবে এ দেশে 'ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক' অনেকটা সঞ্চয়ী ব্যাংকের মতো।

৭. দেশীয় ব্যাংক : স্থানীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থলগ্নীকারী বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানই হল দেশীয় ব্যাংক। এগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে না; কেবল উচ্চ হার সুদে ঋণ প্রদান করে। এ দেশে মহাজন, বেনিয়া, সাহুকার, সুদের ব্যবসায়ী ইত্যাদি হল দেশীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

৮. সমবায় ব্যাংক : সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে সমবায় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক স্বল্প সুদে সদস্যদের ঋণ প্রদান করে। এ ছাড়াও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকদেরকেও ঋণ দেয়। 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক' এ ধরনের একটি ব্যাংক।

৯. ইসলামী ব্যাংক : যে ব্যাংক ইসলামী শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী অনুশাসন ও বিধি বিধান অনুযায়ী কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে। ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করায় এ ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত লেনদেন করে থাকে। মক্কেলদের কাছ থেকে গৃহীত আমানত ব্যবসায় বাণিজ্য ও বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে খাটিয়ে এ ব্যাংক মুনাফা লাভ করলে আমানতকারীদেরকে লাভের অংশ বিশেষ প্রদান করে; আর ক্ষতির সম্মুখীন হলে আমানতকারীদেরকে তার অংশীদার করে। এ ধারণার ভিত্তিতেই ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি হল এ জাতীয় ব্যাংক। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ২০টি দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১০. আন্তর্জাতিক ব্যাংক : উন্নত দেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনে বিভিন্ন দেশের ঘাটতি দূর করা এ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রভৃতি এ ধরনের ব্যাংক।

৭.৩.৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

যে ব্যাংক দেশে মুদ্রা প্রচলন, ঋণ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের আর্থিক প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। আন্তর্জাতিক নিষ্পত্তি ব্যাংক (Bank for International Settlement) -এর আইনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যে ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।" অন্যান্য ব্যাংকের মতো মুনাফা অর্জনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য নয়; বরং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং জনগণের কল্যাণ সাধনই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাংক দেশের সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে তাদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক'। ইংল্যান্ডের 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড', যুক্তরাষ্ট্রের 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম', ভারতের 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' এবং ফ্রান্সের ' ব্যাংক অব ফ্রান্স' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

৭.৩.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

দেশের মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

১. নোট প্রচলন : বর্তমানকালে সবদেশে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে। বাংলাদেশে এ দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। কাগজী নোট প্রচলনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক শতকরা ৩০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে। অন্যান্য দেশেও নোট প্রচলন ক্ষেত্রে এরূপ রিজার্ভ রাখার নিয়ম রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থের যোগান ও দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য নোটের প্রচলন কম বেশি করে।

২. সরকারের ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক সরকারের সকল তহবিলের অভিভাবকরূপে কাজ করে এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব নিকাশ করে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে ঋণ দেয় এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। এ দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

৩. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে যে অর্থ আমানত হিসেবে নেয় তার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। যেমন, ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেকটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে তার চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ৫% ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে নানা ধরনের আদেশ উপদেশের মাধ্যমে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪. সর্বশেষ ঋণদাতা : জনসাধারণকে বেশি ঋণ দান অথবা অন্য কোনো কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো সময় অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন বোধ করতে পারে। এ আর্থিক সংকটের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ লাভে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দিয়ে তাদেরকে আর্থিক সমস্যা থেকে রক্ষা করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয়।

৫. বিনিময় হার ঠিক রাখা : কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ বিনিময় হার যাতে স্থিতিশীল থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করে থাকে।

৬. নিকাশ ঘর : দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনেদেনের কারণে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে চেকের আদান প্রদান হয়। ফলে আন্তঃব্যাংক দেনা পাওনার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে অর্থ জমা থাকে তার দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ রকম দেনা পাওনার নিষ্পত্তি করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের 'নিকাশ ঘর' বলা হয়।

৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হল ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। যদি প্রয়োজনের তুলনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি ঋণ দেয় তাহলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে থাকে। আবার দেশে বেশি ঋণের দরকার হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছু উন্নয়নমূলক কাজ কারে থাকে। যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করে, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক তথ্য ও অবস্থা প্রকাশ করে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখে, দামস্তরের স্থিরতা রক্ষা এবং ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন প্রভৃতি কাজ করে। দেশের আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়নের ব্যাপারেও এ ব্যাংক প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

৭.৪.১ বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে রাখে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা। জনসাধারণের জমাকৃত অর্থের ওপর ব্যাংক কম হারে সুদ দেয়।অন্যদিকে ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ব্যাংক অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ আদায় করে। উভয় সুদের মধ্যে পার্থক্যই হল ব্যাংকের মুনাফা। নিজস্ব কিছু অর্থ থাকলেও এ ব্যাংকের তহবিলের সিংহভাগ অর্থ আমানতকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। চাওয়া মাত্র এ অর্থ আমানতকারীকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে বলে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেবল স্বল্পকালের জন্য ঋণ প্রদান করে। এ জন্যই বাণিজ্যিক ব্যাংককে 'স্বল্প মেয়াদী ঋণের ব্যবসায়ী' বলা হয়। সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক।

৭.৪.২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিচে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে :

১. অর্থ জমা রাখা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হল জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখা। আমানত তিন প্রকার : যথা, ক. চলতি আমানত, খ. সঞ্চয়ী আমানত ও গ. স্থায়ী আমানত।

ক. চলতি আমানতে অর্থ জমাকারী যে কোনো সময় তা উঠাতে পারেন। এ আমানতের ওপর কোনো সুদ দেওয়া হয় না। খ. সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ সাধারণত সপ্তাহে দুবার উঠানো যায়। এই আমানতের ওপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয় গ. স্থায়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখতে হয়।এ আমানতের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ দেওয়া হয়।

২. ঋণদান করা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল ঋণ দেওয়া। জনসাধারণের জমা রাখা অর্থ ব্যবসায়ীদের সুদে ঋণ দেওয়া হয়। আমানতকারী যে কোনো সময় তার জমাকৃত অর্থ উঠাতে পারেন। এ কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের চাহিদা মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত নগদ অর্থ জমা রাখে এবং বাকি অর্থ স্বল্প মেয়াদের জন্য ঋণ দেয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান, মৎস্য চাষ, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঋণ দেয়।

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি : বর্তমানকালে দেশে নোট প্রচলনের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক প্রভৃতি ঋণপত্র ইস্যু করে। এসব ঋণপত্র

বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য লেনদেন গতিশীল হয়। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেন এসব বিনিময়ের মাধ্যম দ্বারা সম্পন্ন হয়।

৪. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা : বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ যোগান দেয়। ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রব্য আদান প্রদান এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের দেনা পাওনার নিষ্পত্তি হয়। এসব কাজের ফলে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

৫. হুন্ডি বাট্টা করা : বর্তমানযুগে অনেক ব্যবসায়িক লেনদেন হুন্ডির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। হুন্ডির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অর্থের দরকার হলে হুন্ডির মালিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে হুন্ডি ভাঙিয়ে নগদ অর্থ প্রদান করে। এ জন্য ব্যাংক সুদ হিসেবে কিছু অর্থ কেটে রেখে হুন্ডির মালিককে অর্থ প্রদান করে। একে হুন্ডি বাট্টাকরণ বলে। এর ফলে আর্থিক লেনদেন সহজ ও নিরাপদ হয় বলে ব্যবসা বাণিজ্য গতিশীল হয়।

৬. অর্থ স্থানান্তর করা : বাণিজ্যিক ব্যাংক একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ প্রেরণ করে থাকে। চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংক মক্কেলদের অর্থ স্থানান্তর করে।

৭. সঞ্চয় বৃদ্ধি : জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে জমা হয়। ব্যাংক এ অর্থ ব্যবসায় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। ফলে দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

এ ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে :

ক. গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে।

খ. নিরাপত্তার জন্য মক্কেলদের মূল্যবান অলংকার, গুরুত্বপূর্ণ দলিল ইত্যাদি সংরক্ষণ করে।

গ. মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, বাড়িভাড়া, বৈদ্যুতিক বিল, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি সংগ্রহ বা প্রদান করে।

ঘ. গ্রাহকদের অছি হিসেবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

ঙ. মক্কেলদের আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

৭.৫.১ ব্যাংকে হিসাব খোলার নিয়ম

জনসাধারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখতে চায়। এ জন্য তাদেরকে পছন্দমতো কোনো ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট শাখায় হিসাব খুলতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকে সাধারণত তিন ধরনের হিসাব খোলা যায়। যথা, (ক) চলতি হিসাব, (খ) সঞ্চয়ী হিসাব ও (গ) স্থায়ী হিসাব। এ হিসাবগুলোতে জমাকৃত অর্থকে ব্যাংকের আমানত বলে। বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার নিয়ম মোটামুটিভাবে এক।

ধরা যাক, এক ব্যক্তি তার নিজের শহরে অগ্রণী ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে ইচ্ছুক। তাকে প্রথমে সেই শাখা ব্যাংক থেকে হিসাব খোলার একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। এখন আবেদনকারীকে শনাক্ত করার জন্য আবেদনপত্রে এমন এক জন ব্যক্তির স্বাক্ষর লাগবে যার এ ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। পূরণকৃত আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর ২টি পাসপোর্ট আকৃতির সত্যায়িত ছবি দিতে হবে। হিসাব খোলার সময় আবেদনকারীকে ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা রাখতে হয়। তবে ন্যূনতম কিছু কমবেশি হয়। হিসাব খোলার সাথে সাথে আবেদনকারীকে একটি হিসাব নম্বর দেওয়া হয়। আমানতকারী এ হিসাব নম্বর ধরেই তার টাকা ব্যাংকে জমা দেন এবং প্রয়োজনমতো টাকা তুলে নেন।

৭.৫.২ হিসাব পরিচালনার নিয়ম

ব্যাংকে একটি হিসাব খোলার সাথে সাথে হিসাবধারী ব্যক্তিকে একটি চেকবই, একটি টাকা জমাবই এবং একটি পাসবই দেওয়া হয়। টাকা জমার বই দ্বারা হিসাবধারী ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো যে কোনো পরিমাণ নগদ অর্থ, চেক, ব্যাংক

ড্রাফট তার হিসাব নম্বরে জমা দিতে পারেন। হিসাবধারী ব্যক্তি তার জমা টাকা থেকে চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের নিয়মের ভিত্তিতে টাকা তুলতে পারেন। চলতি হিসাব থেকে যে কোনো সময় যতবার প্রয়োজন টাকা তোলা যায়। সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সাধারণত সপ্তাহে দুবার টাকা তেলা যায়। স্থায়ী হিসাবে রক্ষিত টাকা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর উঠানো যায়। কেননা বেশি সুদ পাওয়ার আশায় স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা রাখা হয়।

এক জন ব্যক্তি তার ব্যাংক হিসাবে কোন কোন তারিখে কত টাকা জমা দিলেন এবং কোন কোন তারিখে কত টাকা তুললেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাস বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকেই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। হিসাবধারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার হিসাব বন্ধ করে দিতে পারেন। এভাবে যে কোনো ব্যাংকে হিসাব খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ জমা রাখা এবং উঠানো যায়।

৭.৬.১ বিশেষ ধরনের ব্যাংকসমূহ

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ দানের জন্য কতকগুলো ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব ব্যাংককে বিশেষ ঋণদান সংস্থা বলা হয়।

অন্যান্য বিকাশমান দেশের মতো বাংলাদেশে বিশেষ ঋণদানকারী সংস্থা আছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল :

ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

খ. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

গ. গ্রামীণ ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক : স্বাধীনতা লাভের পর পরই বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গঠিত হয়।এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪৫.৬১ কোটি টাকা। এর সবটাই সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কার্যাবলি : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। এ ব্যাংকের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

ক. সার, বীজ , কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি ক্রয় এবং ফসল নিড়ানো, কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য এ ব্যাংক কৃষকদেরকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

খ. চাষের জন্য গবাদি পশু ও হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, জমি সমতল করা, অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক কৃষকদেরকে মধ্যমমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের জন্য দেওয়া হয়।

গ. জমি ও ভারি কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন, ট্রাক্টর, হারভেস্টর ইত্যাদি ক্রয়, গভীর নলকূপ স্থাপন, খাল খনন, গুদাম ঘর নির্মাণ, চা বাগানের উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ পরিশোধ করতে ৫ বছরের বেশি সময় দেওয়া হয়।

২. কৃষি ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

৩. কৃষি ব্যাংক কৃষকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনের জন্য ‘মৌসুমী ঋণ’ প্রদান করে।

৪. কৃষি ব্যাংক উদ্যান উন্নয়ন ও বন উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ঋণ প্রদান করে।

৫. এ ব্যাংক মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, হিমাগার নির্মাণ, জমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প প্রভৃতির জন্য ঋণ প্রদান করে।

৬. কৃষি ব্যাংক হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, মৌমাছি ও গুঁটি পোকার চাষ প্রভৃতি কাজের জন্যও ঋণ প্রদান করে।

৭. এ ব্যাংক পানের বরজ তৈরি, বিভিন্ন ফলের চাষ প্রভৃতির জন্য ঋণ প্রদান করে।

৮. এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এ দেশের কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি ব্যাংকটির ঋণদান পদ্ধতি সহজ ও উদার করা হয়েছে এবং জামানতের কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েছে। ফলে স্বচ্ছল ব্যক্তি ছাড়াও গরীব কৃষকরা ব্যাংকটির ঋণদান কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি ঋণ পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাংক গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এর শাখা অফিস স্থাপন করেছে। বর্তমানে এই ব্যাংকের ১০৫০টিরও বেশি শাখা অফিস রয়েছে।

৭.৬.২ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

দেশে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সাবেক শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক ও ইকুইটি পার্টিসিপেসন ফান্ড নিয়ে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা। ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ব্যাংকটির পরিচালনার জন্য ৯ জন পরিচালক নিয়ে একটি পরিচালক পর্ষদ রয়েছে।

কার্যাবলি : দেশে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক অনেকগুলো কাজ সম্পাদন করে। এ কাজগুলো নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন শিল্পগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। সর্বোচ্চ ২০ বছরের জন্য দেশি ও বিদেশি মুদ্রায় এ ঋণ পরিশোধ করা হয়।

২. প্রয়োজনে এ ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্পমেয়াদী ঋণও প্রদান করে।

৩. দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক বিনামূল্যে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে।

৪. এ ব্যাংক যেসব শিল্পকে ঋণ প্রদান করে তার ঋণ প্রদান পূর্ব অবস্থা ও ঋণ প্রদান উত্তর অবস্থা পর্যালোচনা করে।

৫. এ ব্যাংক বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা করে।

৬. এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে।

৭. এ ব্যাংক দেশের ভেতরে ও বাইরে বিনিময় বিল ও অন্যান্য ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় করে।

বাংলাদেশে শিল্প ব্যাংক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করে থাকে সেসবের মধ্যে পাট শিল্প, সার শিল্প, কাগজ ও মুদ্রণ শিল্প, সুতি, পশমী ও তন্তুজাত শিল্প, কলকারখানা ও খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, পরিবহন সরঞ্জামের কারখানা প্রভৃতি প্রধান।

বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সবেচেয়ে বড় বাধা হল মূলধনের স্বল্পতা। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক শিল্প ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে দেশের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৭.৬.৩ গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামের অতিঅল্প জমির মালিক, ভূমিহীন কৃষক এবং অন্যান্য অতিদরিদ্র জনসাধারণকে উৎপাদনক্ষম কার্যকলাপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য যে বিশেষ ধরনের ব্যাংক রয়েছে তাকে গ্রামীণ ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক। বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য যে বিশেষ ধরনের ব্যাংক রয়েছে তাকে গ্রামীণ ব্যাংক বলে।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭.২০ কোটি টাকা। ব্যাংকের শতকরা ৭৫ ভাগ শেয়ারের মালিক হল ঋণগ্রহীতা সদস্যরা এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ শেয়ারের মালিক সরকার। ব্যাংকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জন্য ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক মন্ডলী রয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে। এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. গ্রামের দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা।

২. গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ থেকে গরীব মানুষকে রক্ষা করা।

৩. সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা।

৪. গ্রামীণ সমাজের দুর্বল অংশগুলোকে সাংগঠনিক সাহায্য দিয়ে অতিরিক্ত জামানত ছাড়াই ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত করে তোলা।

৫. গ্রামীণ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬. ভূমিহীন ও গরীব পরিবারের মহিলাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে : ব্যাংকটি যেসব খাতে ঋণ প্রদান করে তার মধ্যে নিম্নলিখিত খাতগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. ক্ষুদ্র ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ; যেমন ধান, চাল, গুড়, কাঠ ইত্যাদি ব্যবসায় কেন্দ্র এবং দোকান;

২. পরিবহন; যেমন ভ্যান, রিকশা ইত্যাদি ক্রয়;

৩. গ্রামীণ শিল্প; যেমন বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়, সাবান, তেল প্রভৃতি তৈরি;

৪. পশু পালন ও মাছ চাষ; যেমন গরু, বলদ, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন ও মাছ চাষ;

৫. কৃষি ও বন; যেমন শাকসবজি, আখ ও তরমুজ চাষ;

বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামের স্বল্পবিত্ত ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গণি মিয়া তাঁর কাপড়ের বিনিময়ে চাল চান। কিন্তু হাসান আলী চান তার কাপড়ের বিনিময়ে ফলমূল। এ অবস্থায় কাপড় ও চালের বিনিময় সম্ভব নয়। এখানে দ্রব্য বিনিময় প্রথার যে ত্রুটিটি প্রকাশ পেয়েছে তা হল-

ক. দ্রব্য ভাগের অসুবিধা খ. অভাবের মধ্যে অমিল
গ. মূল্য পরিমাপের অসুবিধা ঘ. মূল্য স্থানান্তরের অসুবিধা

২। ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. বিহিত মুদ্রা ও ঐচ্ছিক মুদ্রা খ. প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা
গ. হিসাবী মুদ্রা ও প্রকৃত মুদ্রা ঘ. ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

করিম সাহেব ৫০,০০০/- টাকা জমা করে ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন যাতে প্রয়োজনমতো টাকা তুলে দৈনন্দিন খরচ মেটানো যায়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে, প্রতিমাসে ৫০০/- টাকা জমা দেয়ার ভিত্তিতে, অন্য একটি হিসাব খুলে দেন। শর্ত ছিল যে, তাঁর স্ত্রী ১০ বছরের পূর্বে তাঁর হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারবেন না।

৩। করিম সাহেব যে হিসাব খোলেন সেটি ছিল-

ক. চলতি হিসাব খ. সঞ্চয়ী হিসাব
গ. স্থায়ী হিসাব ঘ. মেয়াদী হিসাব

৪। করিম সাহেবের স্ত্রীর হিসাবে ১০ বছরের শর্ত থাকার কারণ; হিসাবটি ছিল -

ক. দীর্ঘমেয়াদী হিসাব খ. অধিক সুদের চলতি হিসাব
গ. ১০ বছরের সঞ্চয়ী হিসাব ঘ. ১০ বছরের স্থায়ী হিসাব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দরিদ্র আয়শা খাতুন যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে কোনো বন্ধকী ছাড়াই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এখন তার বাড়ির আশে পাশের লোকজন জামা, সেলোয়ার, কামিজ প্রভৃতি তৈরির জন্য তার কাছে আসে। বর্তমানে আয়শা খাতুন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে আরো দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং ইতোমধ্যে তিনি ৩ জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। এভাবে তিনি উক্ত ব্যাংকের সহায়তায় নিজের দরিদ্রতা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন।

৫। আয়শা খাতুন যে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন তার নাম কি?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. শিল্প ব্যাংক
গ. সমবায় ব্যাংক ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৬। আয়শা খাতুন যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেন সেই ব্যাংকের প্রধান কাজ হল-

i. বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান
ii. স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
iii. গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৭। কোনো একসময় মার্কিন ডলারের সাথে বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময় হার হল ১:৬০। যদি এক ব্যক্তি ১২,০০০/ টাকা বিনিময় করেন তাহলে তিনি ডলারে পাবেন-

ক. ৬০ খ. ১২০
গ. ২০০ ঘ. ৬০০

৮। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদানের অবশ্যম্ভাবী ফল কোনটি?

i. পুঁজি গঠনে সহায়তা
ii. দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৯। নিচের কোন্‌টি বিশেষায়িত ব্যাংক?

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

গ. সোনালী ব্যাংক ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জরিনা বেগম একজন দরিদ্র মহিলা। রিক্সাচালক স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রায় পথে বসেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি তাঁর এক পরিচিত মহিলার পরামর্শে স্থানীয় একটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করেন। ব্যাংক যথারীতি সম্পূর্ণ বিনা জামানতে তাঁকে ৫০০/- টাকা ঋণ দেয়। উক্ত টাকা দিয়ে তিনি কুটির শিল্পের কাজ শুরু করেন। অতিঅল্প সুদে ও সহজ কিস্তিতে তিনি টাকা পরিশোধ করে পরবর্তীতে আরো বড় অংকের ঋণ নেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল মহিলা।

ক. জরিনা বেগম যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেন তার নাম কি?

খ. এ ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

গ. এ ব্যাংক কীভাবে জরিনা বেগমের দারিদ্র্য বিমোচন করেছিল তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে এ ব্যাংক বিকল্পহীন"- তুমি কি এ উক্তির সাথে একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২। জনাব মোখলেছের কেইন ফার্নিচার বিক্রির একটি ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। যখন তিনি এই ব্যবসা শুরু করেন তখন তিনি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে কোনো জামানত ছাড়া ঋণ নেন। তাঁর ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং তিনি বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খোলেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য শিল্প ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী।

ক. চলতি হিসাব কী?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাখ্যা দাও।

গ. জনাব মোখলেছের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য শিল্প ব্যাংক কীভাবে অবদান রাখতে পারে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো জামানত ছাড়া ব্যাংক কোনো ঋণ দিতে পারে না।" তুমি কি এই উক্তিটির সাথে একমত? এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি কার্যক্রমের সফলতা ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের আয় ব্যয়

INCOME AND EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT OF BANGLADESH

৮.১.১ সরকারি আয় ব্যয়

আধুনিককালে সরকারকে দেশের অভ্যন্তরে প্রশাসন পরিচালনা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারকার্য এবং জনগণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তাছাড়া বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাও সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এসব কাজের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকার দেশের জনগণের কাছ থেকে কর আদায় ও অন্যান্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও দেশের প্রশাসন পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারকার্য, দেশ রক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। এ জন্য আমাদের সরকারকে কর ও কর বহির্ভূত বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ আয় করতে হয়। বর্তমানকালে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সরকারের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকারি আয় ব্যয়ের পরিধি ও গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

৮.১.২ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎসসমূহ

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর কর থেকে এবং কর ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে অর্থ আয় করে। সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১. বাণিজ্য শুল্ক : বাণিজ্য শুল্ক বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। দেশের রপ্তানি ও আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে বাণিজ্য শুল্ক বলে। বিদেশে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করা হয়।

২. আবগারি শুল্ক : দেশের ভেতরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বলে। বাংলাদেশে চা, চিনি, তামাক, সিগারেট, দিয়াশলাই, কেরোসিন, ওষুধ, প্রসাধনী প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

৩. মূল্য সংযোজন কর : এটি একটি পরোক্ষ কর। বাংলাদেশে বিক্রয় করের বিকল্প হিসেবে এ কর ধার্য করা হয়। সংক্ষেপে এটি 'ভ্যাট '(VAT)' নামে পরিচিত। দেশে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যের ভিত্তিতে এ কর ধার্য করা হয়।

৪. আয়কর : জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে। মহিলা করদাতা, ৭০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী করদাতা ব্যতীত যাদের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার বেশি তাদেরকে আয়কর দিতে হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির আয়ের ওপর কর্পোরেশন কর আরোপ করা হয়। আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর।

৫. ভূমি রাজস্ব : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হল ভূমি রাজস্ব। স্বাধীনতার পর সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করায় এ খাতে সরকারি আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকার ভূমির ওপর উন্নয়ন কর আরোপ করেছে।

৬. স্ট্যাম্প : বিভিন্ন দলিলপত্র ও মামলা মোকদ্দমার আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদির ওপর স্ট্যাম্প বসাতে হয়। স্ট্যাম্প বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার আয় করে থাকে।

৭. রেজিস্ট্রেশন : বিভিন্ন দলিলপত্র রেজিস্ট্রি করতে হলে সম্পত্তির মূল্যের ওপর সরকারকে রেজিস্ট্রেশন ফী দিতে হয়।

৮. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান : স্বাধীনতার পর বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ সরকারি আয় হিসেবে গণ্য।

৯. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প : স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে যেগুলো এখনও সরকারি মালিকানায় রয়েছে সেগুলো থেকে সরকারের আয় হয়। তবে বিগত বছরগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো লোকসান দিচ্ছে।

১০. সুদ : সরকার দেশের বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মচারীদের সুদে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এ ঋণের ওপর সরকার সুদ আদায় করে।

১১. ডাক, তার ও দূরালাপনী : বাংলাদেশ সরকার ডাক বিভাগ থেকে আয় করে। এ ছাড়া তার ও দূরালাপনী থেকেও সরকারের আয় হয়।

১২. রেলওয়ে : বাংলাদেশ রেল বিভাগে যাত্রী ও দ্রব্যসামগ্রী পরিবহনের ভাড়া বাবদ সরকারের কিছু আয় হয়। তবে গত কয়েকবছর ধরে রেল বিভাগে ক্রমাগত লোকসান হচ্ছে।

১৩. বন : বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বনাঞ্চল থেকে কাঠ, বাঁশ, মধু ও অন্যান্য বনজ সম্পদ বিক্রয় করে সরকার আয় করে থাকে।

১৪. যানবাহনের ওপর কর : সরকার মোটর গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর ধার্য করে।

আয়ের উপরোক্ত উৎসগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরো কিছু কিছু উৎস থেকে আয় করে। এগুলোর মধ্যে প্রমোদ কর, সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ কর, পেট্রোল কর ও গ্যাসের ওপর কর, বিদেশ ভ্রমণের কর, সেচ কর, অপরাধীদের অর্থদন্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৮.১.৩ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১. প্রতিরক্ষা : বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হল প্রতিরক্ষা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করা দরকার। তাই সামরিক বাহিনীর বেতন, ভাতা, প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্য প্রতিবছর সরকারি বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয়।

২. বেসামরিক প্রশাসন : দেশে বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার জন্য এ ব্যয় হয়।

৩. শিক্ষা : বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রাথমিক, উপানুষ্ঠানিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাসহ নারী শিক্ষার উন্নয়নে সম্প্রতি প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

৪. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : জনসাধারণকে চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, চিকিৎসক ও কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও ভাতা প্রদান বাবদ বিপুল অর্থ প্রদান করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কাজের জন্য সরকারি ব্যয় ক্রমশ বাড়ছে।

৫. পুলিশ : দেশের ভেতরে আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী রয়েছে। সরকারকে পুলিশ বাহিনীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

৬. বাংলাদেশ রাইফেলস : দেশের সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান রোধের জন্য বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) বাহিনী দায়িত্ব পালন করে। এ বাহিনীর জন্য প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

৭. বিচার ও কারা বিভাগ : দেশের সর্বত্র বিচার বিভাগ পরিচালনা এবং কারাগারগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি ব্যয় আবশ্যক। এ খাতে সরকারকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৮. বেসামরিক পূর্ত কাজ : রাস্তাঘাট, সেতু ও সরকারি ভবনসমূহ নির্মাণ ও মেরামত, শহর সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

৯. রাজস্ব আদায়কারী বিভাগসমূহ : সরকারি রাজস্ব আদায়কারী বিভাগগুলো যেমন, আয়কর বিভাগ, বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির জন্য মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়।

১০. ঋণ ও সুদ পরিশোধ : উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে যে ঋণ নেয় তা সুদ ও আসলসহ পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করতে হয়।

১১. সমাজকল্যাণ কার্যক্রম : জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের জন্য দেশে পার্ক, স্টেডিয়াম, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। এসবের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিবছর সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১২. অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান : সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

১৩. ভর্তুকি : জনস্বার্থে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন খরচের যে অংশ সরকার বহন করে তাকে ভর্তুকি বলে। সরকার জনসাধারণকে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঐসব দ্রব্যসামগ্রীর ওপর ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। এ বাবদ সরকারকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৪. বৈদেশিক বিষয় : বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তা বজায় রাখা, বিদেশে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য সরকারকে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হয়। এ কাজে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়।

১৫. হিসাব নিরীক্ষা : সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় ব্যয়ের হিসাব বছরান্তে পরীক্ষা করাকে নিরীক্ষা বলা হয়। এ কাজে সরকার প্রতিবছর যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে।

১৬. অপ্রত্যাশিত ব্যয় : বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৭. বিবিধ ব্যয় : উল্লিখিত ব্যয়ের খাতসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবছর আরো কতিপয় খাতে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন, আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, দুস্থ ও বার্ধক্য ভাতা প্রদান ইত্যাদি।

৮.২.১ বাজেট (Budget)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত একবছরে সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবের বিবরণকে বাজেট বলে। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতে সরকার বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে এবং কোন কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সে ব্যয় নির্বাহ করবে তার একটি বিবরণী তৈরি করে। এ বিবরণীতে একদিকে আয়ের হিসাব এবং অন্যদিকে ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়। এ বিবরণীই হল বাজেট। অতএব কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের সম্ভাব্য সরকারি আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশকে বাজেট বলা যায়।

উল্লেখ্য, বাজেটে কেবল সরকারি সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের হিসাব থাকে না; বরং সরকারি আয় ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কীভাবে ঘাটতি পূরণ হবে, ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে সে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কী করা হবে ইত্যাদি বিষয়ও বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়ন করে দেশের আইন সভায় অনুমোদন করিয়ে নিলে বাজেটে নির্ধারিত আয় ব্যয় ও তার পদ্ধতি কার্যকর হয়।

৮.২.২ বাজেটের প্রকারভেদ

বাজেটকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা, সুষম বাজেট বা সমতাপ্রাপ্ত বাজেট (Balanced Budget) এবং অসম বাজেট বা সমতাহীন বাজেট (Imbalanced Budget)। আয় ব্যয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজেটের দুটো অংশ থাকে। যা রাজস্ব বাজেট (Revenue Budget) এবং মূলধন বাজেট (Capital Budget)

১. সুষম বাজেট : যে বাজেটে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান থাকে তাকে সুষম বাজেট বলে।

২. অসম বাজেট : যে বাজেটে আয় ও ব্যয় সমান থাকে না তাকে অসম বাজেট বলে।

অসম বাজেট আবার দুপ্রকার; যথা, উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget) এবং ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)।

ক. উদ্বৃত্ত বাজেট : যে বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশি ধরা হয় তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

খ. ঘাটতি বাজেট : যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ধরা হয় তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।

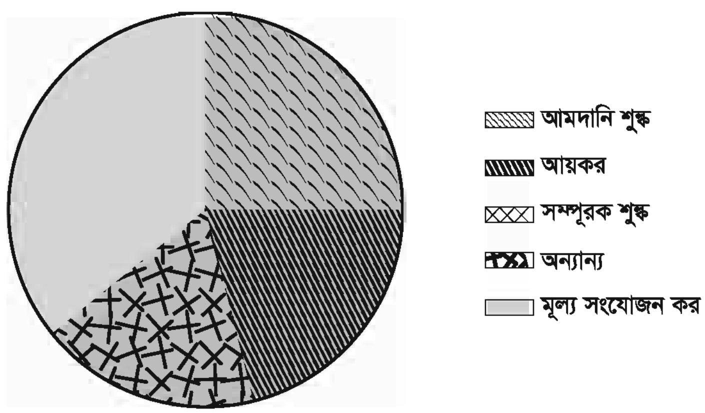
১. রাজস্ব বাজেট : দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যে বাজেট গৃহীত হয় তাকে রাজস্ব বাজেট বলে। এ বাজেটে কেবল সরকারের রাজস্ব আয় এবং প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো হয়। এ বাজেটের দুটি অংশ থাকে- আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত। আয়ের অংশে সরকারের সম্ভাব্য মোট আয় উল্লেখ করা হয় এবং কোন কোন উৎস থেকে এ আয় আসবে তাও বর্ণনা করা হয়। একইভাবে ব্যয়ের খাতে সরকারের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে তার উল্লেখ থাকে। রাজস্ব বাজেটের অর্থ সাধারণত প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, বেসামরিক প্রশাসন, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হয়।

২. মূলধন বাজেট : দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে বাজেট করা হয় তাকে মূলধনী বাজেট বলে। এ বাজেটে সরকার কর্তৃক গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়। যেমন, একবছরে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, পরিবহন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি খাতের উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় হবে তা এ বাজেটে দেখানো হয়। পাশাপাশি এ ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন কোন উৎস থেকে আয় সংগৃহীত হবে তাও এ বাজেটে উল্লেখ করা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মূলধন বাজেটে দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ও প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়। এ বাজেটের আয় প্রধানত রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

চিত্রে প্রদত্ত পাই চার্ট থেকে নিচের ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



১। প্রদত্ত চিত্রানুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?

ক. আয়কর খ. আমদানি কর
গ. সম্পূরক শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

২। চিত্রানুযায়ী বাংলাদেশের আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হচ্ছে বাণিজ্য শুল্ক। এ শুল্ক কিসের ওপর ধার্য করা হয়?

i. দেশের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর
ii. দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর উপর
iii. দেশের রপ্তানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর উপর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

৩। জনস্বার্থে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন খরচের যে অংশ সরকার বহন করে তাকে বলে-

ক. উৎপাদন ব্যয় খ. অপ্রত্যাশিত ব্যয়
গ. ভর্তুকি ঘ. রিলিফ

৪। চা ও চিনি উৎপাদনের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তা হল-

ক. উৎপাদন কর খ. বাণিজ্য শুল্ক
গ. আবগারি শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৫। জনাব শোয়েব একজন সামরিক বাহিনীর লোক। তিনি প্রতিমাসে বেতন-ভাতা পান। তাঁর বেতন- ভাতা সরকারি ব্যয়ের কোন খাত থেকে আসে ?

ক. বেসরকারি প্রশাসন খ. সামরিক খাত
গ. প্রতিরক্ষা খাত ঘ. পুলিশ বিভাগ

নিচের সারণির আলোকে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি দেশের করহার দেখানো হল

আয়স্তর	করহার
০-১,২০,০০০	০%
১,২০,০০১-২,৫০,০০০	১৫%
২,৫০,০০১-৩,০০,০০০	২০%
৩,০০,০০১-৫,০০,০০০	২৫%

৬। জনাব নাসিরের বার্ষিক আয় ২,৩০,০০০ টাকা। প্রদত্ত করহার অনুসারে তাকে বার্ষিক কত টাকা কর দিতে হবে?

ক. ৪৬,০০০/- টাকা খ. ৩৫,৪০০/- টাকা
গ. ৩৪,৫০০/- টাকা ঘ. ৩০,০০০/- টাকা

৭। তাঁর আয় যদি আরো ১,০০,০০০/- টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে তাঁকে বর্তমানের চেয়ে শতকরা কতভাগ বেশি কর দিতে হবে?

ক. ৫% খ. ১০%
গ. ১৫% ঘ. ২০%

৮। কোন খাতগুলো সরকারের মূলধন বাজেটের আওতায় পড়ে?

ক. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খ. শিল্প, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ
গ. বিদ্যুৎ, পরিবহন ও স্বাস্থ্য ঘ. কৃষি, বিদ্যুৎ ও শিল্প

৯। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হল ভূমি রাজস্ব। বাংলাদেশ সরকার ভূমির ওপর নিচের কোন করটি আরোপ করেছে?

ক. আয়কর খ. উন্নয়ন কর
গ. ভূমি কর ঘ. মূল্য সংযোজন কর

১০। নিচের কোন করটি বাংলাদেশে বিক্রয় করের বিকল্প হিসাবে আরোপ করা হয়-

ক. আমদানি শুল্ক খ. আয়কর
গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. প্রমোদ কর

১১। নিচের সারণিতে বাজেট উপাত্ত দেয়া হল। কোন শব্দগুচ্ছ বাজেটের প্রবণতাকে ভালোভাবে বর্ণনা করে?

বছর	সরকারি ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	সরকারি আয় (বিলিয়ন টাকা)
১	৯৫০	৮০০
২	১০০০	১০০০
৩	১১০০	১২০০

ক. উদ্বৃত্ত থেকে ঘাটতি খ. ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্ত
গ. ঘাটতি বেড়েছে ঘ. উদ্বৃত্ত বেড়েছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের সরকারি আয়ের প্রধান খাতগুলো একটি দেশের ২০০৬-২০০৭ ইংরেজি আর্থিক বছরের সম্ভাব্য বাজেট অনুযায়ী দেয়া হল। এ থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আয়ের ধরন	আয়ের খাত	কোটি টাকা (ধার্যকৃত)
মোট কর রাজস্ব	বাণিজ্য শুল্ক	১৫,০০০/-
	আবগারী শুল্ক	৮,০০০/-
	মূল্য সংযোজন কর	১২,০০০/-
	ভূমি রাজস্ব	৫,০০০/-
	সম্পদ (ব্যাংক, বীমা)	৩,০০০/-
	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	২৫,০০০/-
	আয়কর	১২,০০০/-
	অন্যান্য	৬,০০০/-
	মোট =	৮৬,০০০/-

ক. বাজেট কী?
খ. উল্লিখিত বাজেটে সরকারের আয়ের প্রধান খাতটির বর্ণনা দাও।
গ. প্রদর্শিত বাজেটের প্রধান দুটি খাতের তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঘ. 'বাংলাদেশ সরকারের আয়ের পরিধি বাড়ানো যেতে পারে' যুক্তি, বিচার বিশ্লেষণ করে উত্তর দাও।

২০১০ শিক্ষাবর্ষ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য